সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা

রাদিয়াল্লাহু আনহুম

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা

রাদিয়াল্লাহু আনহুম

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ ও সংকলন

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

ফোন : ৮৩১১২৯২, মোবাইল : ০১৭৫৩৪২২২৯৬

E-mail : shotabdipro@yahoo.com

www.maudoodiacademy.org

সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ ও সম্পাদনা : আবদুস শহীদ নাসিম

শ.প্র. : ০৬

ISBN : 984-645-015-X

প্রকাশক

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেইলগেট, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৮৩১১২৯২, মোবা : ০১৭৫৩৪২২২৯৬

ই-মেইল : shotabdipro@yahoo.com

www.maudoodiacademy.org

প্রথম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ ঈসায়ী

পঞ্চম মুদ্রণ : জুলাই ২০১১ ঈসায়ী

কম্পোজ

Saamra Computer

মুদ্রণ

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

দাম : ৩৮.০০ টাকা মাত্র

SAHABAYE KIRAMER MORJADA by Sayyed Abul A'la Maudoodi, Compiled & Translated by Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone: 8311292, Mobile: 01753422296, E-mail: shotabdipro@yahoo.com. www.maudoodiacademy.org 1st Print: February 1989, 5th Edition: July 2011.

Price Tk. 38.00 Only

আমাদের কথা

প্রিয় রসূল সা. বলেছেন : 'আমার সাথিরা উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ।' আর এ মানুষগুলোর প্রতি আল্লাহ্ পাক যে রাজি হয়ে গেছেন, সে কথা পবিত্র কুরআনেই ঘোষিত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে ঈমান ও দীনের যথার্থ জ্ঞানে, নিষ্ঠা ও অবিচল বিশ্বাসে, আমলের পরিপূর্ণতায় এবং দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বোচ্চ কুরবানি প্রদানে আর সামষ্টিক জীবনে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসায়, দয়া, অনুগ্রহ, আত্মত্যাগ ও কল্যাণ কামনায়, সীসাঢালা প্রাচীরের মতো সংঘবদ্ধতায় আর চিন্তার ঐক্য ও সৎ কাজের প্রতিযোগিতায় তাঁরা ছিলেন এক সুউচ্চ আলোর মিনারের মতো। আর সে আলো ছিলো কিতাবুল্লাহ্ এবং সুন্নতে রসূলের পরিপূর্ণ রূপায়ণ।

সাহাবায়ে কিরামের এই যে অনুপম গুণাবলী আর সুউচ্চ মর্যাদা, তার নিখুঁত চিত্র অংকিত হয়েছে মরহুম মাওলানা মওদূদীর ক্ষুরধার লেখনীতে। কুরআনের তফসিরে, সীরাতের আলোচনায়, ইসলামি সমাজের রূপরেখা অংকনে- মোটকথা তাঁর সমগ্র লেখনিতেই ছড়িয়ে রয়েছে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা ও গুণাবলীর উদাহরণ।

সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর অনেক লেখা তাঁর তফসির ও বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমরা তাঁর বিখ্যাত তফসির তাফহীমুল কুরআন ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে কিছু লেখা এ বইতে সংকলন ও সংযোজন করে দিয়েছি।

এ প্রসঙ্গে আমরা জনাব আসেম নুমানি সাহেবের একটি পুস্তিকা থেকেও কিছু উপাত্ত নিয়েছি।

তাঁর গোটা গ্রন্থ ভান্ডারে এ বিষয়ের উপর যতোগুলো লেখা ছড়িয়ে আছে তার একটি অংশই মাত্র এ পুস্তিকায় সংকলিত হয়েছে।

সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা অনুধাবনে এবং আলোর মিনারের মতো তাঁদের সেই সমাজটিকে অনুসরণের ক্ষেত্রে পুস্তিকাটি সকল পাঠককেই অনুপ্রাণিত করবে বলে আশা করি। আর সে মহৎ আশা নিয়েই পুস্তিকাটির বঙ্গানুবাদ করলাম। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সাহাবায়ে কিরামের রা. গুণাবলী অর্জনের তৌফিক দিন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী
২১ নভেম্বর ১৯৮৮ ঈসায়ী

সূচিপত্র

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ •

"আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ এবং তার সাথিরা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদের দেখবে রুকু ও সাজদাবনত। তাদের পরিচয় তাদের মুখমন্ডলে সাজদার প্রভাবে পরিস্ফুট। তাদের পরিচয়ের এই উপমা যেমন তাওরাতে রয়েছে, তেমনি রয়েছে ইনজিলেও।" (আল কুরআন ৪৮ : ২৯)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীগণ

০১. সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ

রসূলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ জীবন অনুসরণের নির্দেশ দেবার পর আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কিরামের কর্মনীতি মুসলমানদের সামনে আদর্শ নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন, যাতে করে, ঈমানের মিথ্যা দাবিদারদের চরিত্র আর রসূলুল্লাহ সা.-এর নিষ্ঠাবান সাহাবায়ে কিরামের চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য সম্পূর্ণ রূপে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। যদিও ঈমানের বাহ্যিক ঘোষণার দিক থেকে তারা (মুনাফিকরা) এবং এঁরা একই মুসলিম জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়ে আসছিল এবং উভয় শ্রেণীর লোকেরাই নামাযের জামায়াতে শরীক হতো, কিন্তু যখনই কঠিন পরীক্ষার সময় উপস্থিত হতো, তখন আকস্মিকভাবে উভয় শ্রেণীর লোকেরা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে পড়তো। তখন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত নিষ্ঠাবান অনুসারী কে, আর কে শুধু নামকাওয়াস্তে মুসলমান তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট ধরা পড়ে যেতো।[১]

০২. সাহাবায়ে কিরাম, কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এবং রসূলুল্লাহ সা.

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, কুরাইশ নেতারা রসূলুল্লাহ সা.-কে বলতো : " বেলাল, সুহাইব, খাব্বাব আর ইবনে মাসউদ রা.-এর মতো দরিদ্র লোকেরা সব সময় তোমার সংগে থাকে। আমরা তো আর তাদের সাথে একত্রে বসতে পারিনা। ওদের সরিয়ে দাও, তবেই আমরা তোমাদের দরবারে আসা যাওয়া করতে পারি এবং বুঝতে পারি যে তুমি আসলে কি বলতে চাও।" তাদের এই বক্তব্যের জবাবে আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ সা.-কে বলে দিলেন : কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে যারা তোমার চারপাশে এসে একত্র হয়েছে আর দিনরাত নিজেদের রবের স্মরণে ও আলোচনায় নিরত থাকছে, তাদের সাথিত্ব দ্বারাই তুমি তোমার হৃদয়কে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করো। তাদের থেকে কখনো দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়োনা।[২]

০৩. সাহাবায়ে কিরামের জন্যে ফেরেশতাদের দোয়া

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا •

"যারা আল্লাহর আরশ বহন করছে আর যারা উপস্থিত রয়েছে তাঁর চারপাশে, তারা সকলেই তাদের রবের হামদ সহকারে তাঁর তাসবীহ করছে। তারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করে।" (সূরা আল মুমিন : আয়াত ৭)

রসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীগণের সান্ত্বনার জন্যে একথা বলা হয়েছে। তাঁরা তখন মক্কার কাফিরদের তীব্র বিরোধী কথাবার্তা, যুলুম নিপীড়ন এবং তাদের মোকাবিলায় নিজেদের অক্ষম অসহায় অবস্থা দেখে দেখে মনভাংগা হয়ে পড়ছিলেন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁদের বলা হলো, এই হীন নীচ লোকদের কথাবার্তায় তোমরা কেন মন খারাপ করছো? তোমাদের মর্যাদা তো এতো বড় যে, আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতারা আর আরশের চারপাশে উপস্থিত ফেরেশতারা পর্যন্ত তোমাদের সাহায্যকারী। প্রতিনিয়ত তারা আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্যে সুপারিশ করে। এখানে সাধারণ ফেরেশতাদের পরিবর্তে আল্লাহর আরশ বহনকারী এবং তার আশ-পাশের ফেরেশতাদের কথা এ জন্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রাজ্যের সাধারণ কর্মচারীরা তো দূরের কথা, তাঁর সম্রাজ্যের স্তম্ভ এবং বিশ্ব শাসক আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী ফেরেশতারা পর্যন্ত তোমাদের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ও গভীর সহানুভূতি বোধ করেন।[৩]

০৪. রসূলুল্লাহ সা.-এর তত্ত্বাবধান ও ফয়েজপ্রাপ্ত

আমরা এ উভয় সাহাবীর (উমর রা. এবং খালিদ রা.) বুযুর্গী এবং দীনি খেদমত ঠিক তেমনিভাবে স্বীকার করি, যেভাবে স্বীকার করা একজন মুসলমানের উচিত। তাঁদের সাথে হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করা আমার দৃষ্টিতে স্বয়ং ইসলাম ও রসূলুল্লাহ সা.-এর সংগে দুশমনী করার সমতুল্য। উমর রা. ইসলামের প্রচার, প্রসার, প্রতিষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে যা কিছু করেছেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত যোগ্যতার ফসল নয়, বরঞ্চ তা ছিলো সেই ফয়েজেরই প্রভাব, যা রসূলুল্লাহ সা.-এর জ্যোতির তোফায়েলে তিনি লাভ করেছিলেন। আবু বকর রা. উসমান রা. আলী রা. এবং অন্যান্য অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এই একই উৎস থেকে ফয়েজপ্রাপ্ত

হন। এ পর্যায়ে ফারুকে আযম রা. কেবল একক ব্যক্তিই ছিলেন না, বরঞ্চ রসূলুল্লাহ সা. মানবতার যে চরম বিকশিত নমুনা পেশ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তারই একজন।[৪]

০৫. সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ

"তাদের মুখমন্ডলে সিজদা সমূহের চিহ্ন ভাস্বর হয়ে আছে, যার দ্বারা তারা স্বাতন্ত্র্য সহকারে পরিচিত।" (সূরা আল ফাতাহ : আয়াত ২৯)

আল্লাহর একথাটির প্রকৃত তাৎপর্য হলো, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর সংগি সাথিরা এমন লোক যে, তাঁদের দেখা মাত্রই যে কোনো লোক বুঝতে পারে, এরা হলেন সর্বোত্তম মানুষ। কেননা, আল্লাহর আনুগত্যের নূর তাদের চেহারায় দীপ্ত জৌতিতে জ্বলজ্বল করছে। তাঁদের এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেই ইমাম মালিক র. বলেন : সাহাবায়ে কিরামের বাহিনী যখন সিরিয়ায় প্রবেশ করলো, তখন সেখানকার খৃষ্টানরা বলতে লাগলো, মসীহ আলাইহিস সালামের হাওয়ারীদের গুণ বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা শুনে আসছিলাম, এরা যে দেখছি ঠিক সেইসব গুণবৈশিষ্ট্যেরই অধিকারী।[৫]

০৬. ইসলামের জন্যে সাহাবীগণের ত্যাগ ও কুরবানি

এক : মক্কী যুগের শেষ তিন-চার বছরে ইয়াসরেবে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে অপ্রতিহত গতিতে। সেখানকার লোকেরা আরবের অন্যান্য এলাকার গোত্রগুলোর তুলনায় অধিকতর সহজে ও নির্দ্বিধায় এ আলো গ্রহণ করতে থাকে। শেষে নবুওয়তের দ্বাদশ বছরে হজ্জের সময় ৭৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল রাতের আঁধারে রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে সাক্ষাত করলে, তারা কেবল ইসলাম গ্রহণই করেননি বরং তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে নিজেদের শহরে স্থান দেয়ারও আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এটি ছিলো ইসলামের ইতিহাসের একটি বৈপ্লবিক পট পরিবর্তন। মহান আল্লাহ তার নিজ অনুগ্রহে এ দুর্লভ সুযোগটি করে দিয়েছিলেন এবং রসূলুল্লাহ সা.-ও হাত বাড়িয়ে তা লুফে নিয়েছিলেন। ইয়াসরেববাসীরা রসূলুল্লাহ সা.-কে শুধুমাত্র একজন শরণার্থী হিসেবে নয় বরং আল্লাহ্র প্রতিনিধি এবং নেতা ও শাসক হিসেবেও আহবান করেছিলেন। আর তাঁর অনুসারীদেরকে তারা একটি অপরিচিত দেশে নিছক মুহাজির হিসেবে বসবাস করার জন্যে আহবান জানাচ্ছিলেন না। বরং আরবের বিভিন্ন এলাকায় ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যেসব মুসলমান ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো

তাদের সবাইকে ইয়াসরেবে জমা করে ইয়াসরেবী মুসলমানদের সাথে মিলে একটি সুসংবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলাই ছিলো এর উদ্দেশ্য। এভাবে মূলত ইয়াসরেব নিজেকে "মদিনাতুল ইসলাম" তথা ইসলামের নগর হিসেবে উপস্থাপিত করলো। রসূলুল্লাহ সা. তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে সেখানে আরবের প্রথম দারুল ইসলাম গড়ে তুললেন।

এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণের অর্থ কি হতে পারে সে সম্পর্কে মদিনাবাসীরা অনবহিত ছিলনা। এর পরিষ্কার অর্থ ছিলো, একটি ছোট্ট শহর আরবের উদ্যত তরবারি এবং সমগ্র দেশবাসীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বয়কটের মোকাবিলায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কাজেই আকাবার বাইআত গ্রহণ করার সময় সেদিনের সেই রাত্রিকালীন মজলিসে ইসলামের প্রাথমিক সাহায্যকারীরা (আনসারগণ) এ পরিণাম সম্পর্কে পুরোপুরি জেনে বুঝেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে নিজেদের হাত রেখেছিলেন। যখন এ বাইআত অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো ঠিক তখনই ইয়াসরেবী প্রতিনিধি দলের সর্বকনিষ্ঠ যুব সদস্য আস'আদ ইবনে যুরারাহ রা. উঠে বললেন :

"থামো, হে ইয়াসরেববাসীরা! আমরা একথা জেনে বুঝেই এঁর কাছে এসেছি যে, ইনি আল্লাহর রসূল এবং আজ এঁকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে সমগ্র আরববাসীর শত্রুতার ঝুঁকি নেয়া। এর ফলে তোমাদের শিশু সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে এবং তোমাদের উপর তরবারি বর্ষিত হবে। কাজেই যদি তোমাদের এ আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা থাকে তাহলে এঁর দায়িত্ব গ্রহণ করো। আল্লাহ এর প্রতিদান দেবেন। আর যদি তোমরা নিজেদের প্রাণকে প্রিয়তর মনে করে থাকো তাহলে এ দায়িত্ব ত্যাগ করো এবং পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের অক্ষমতা জানিয়ে দাও। কারণ এ সময় অক্ষমতা প্রকাশ করা আল্লাহর কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হতে পারে।"

প্রতিনিধি দলের আরেকজন সদস্য আব্বাস ইবনে উবাদাহ ইবনে নাদ্‌লাহ রা. এ কথারই পুনরাবৃত্তি করেন এভাবে :

"তোমরা কি জানো, এ ব্যক্তির হাতে কিসের বাইয়াত করছো? (ধ্বনি : হ্যাঁ আমরা জানি) তোমরা এঁর হাতে বাইআত করে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ঝুকি নিচ্ছো। কাজেই যদি তোমরা মনে করে থাকো, যখন তোমাদের ধন-সম্পদ ধ্বংসের মুখোমুখি হবে এবং তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হবার আশংকা দেখা দেবে তখন তোমরা এঁকে শত্রুদের

হাতে সোপর্দ করে দেবে, তাহলে আজই বরং এঁকে ত্যাগ করা ভালো। কারণ আল্লাহর কসম, এটা দুনিয়ায় ও আখেরাতে সবখানেই লাঞ্ছনার কারণ হবে। আর যদি তোমরা মনে করে থাকো, এ ব্যক্তিকে তোমরা যে আহবান জানাচ্ছো, নিজেদের ধন-সম্পদ ধ্বংস ও নেতৃস্থানীয় লোকদের জীবন নাশ সত্ত্বেও তোমরা তা পালন করতে প্রস্তুত থাকবে, তাহলে অবশ্যি তাঁর হাত আঁকড়ে ধরো। কারণ আল্লাহর কসম, এরই মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ।"

এ কথায় প্রতিনিধি দলের সবাই এক বাক্যে বলে উঠলেন : "আমরা এঁকে গ্রহণ করে আমাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করতে ও নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হবার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।"

এ ঘটনার পর সেই ঐতিহাসিক বাইআত অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে একে আকাবার দ্বিতীয় বাইআত বলা হয়।[৬]

দুই : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ় সংকল্প নিলেন যে, বর্তমানে যতটুকু শক্তি-সামর্থ আমাদের আছে তাই নিয়েই আমরা বের হয়ে পড়বো। দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকার ও টিকে থাকার ক্ষমতা কার আছে এবং কার নেই ময়দানে তার ফায়সালা হয়ে যাবে।

এ চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবার সংকল্প করেই তিনি আনসার ও মোহাজিরদের একত্র করলেন। তাদের সামনে পরিস্থিতি পরিষ্কার করে তুলে ধরলেন। একদিকে উত্তরে বাণিজ্য কাফেলা এবং অন্যদিকে দক্ষিণে এগিয়ে আসছে কুরাইশদের সেনাদল। আল্লাহর ওয়াদা, এ দু'টির মধ্য থেকে কোনো একটি তোমরা পেয়ে যাবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : বলো, এর মধ্য থেকে কার মোকাবিলায় তোমরা এগিয়ে যেতে চাও? জবাবে বিপুল সংখ্যক সাহাবী মত প্রকাশ করলেন : কাফেলার উপর আক্রমণ চালানো হোক। কিন্তু রসূলুল্লাহ সা.-এর সামনে ছিলো অন্য কিছু অভিপ্রায়। তাই তিনি নিজের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। একথায় মোহাজিরদের মধ্য থেকে মিকদাদ ইবনে আমর রা. উঠে বললেন :

يَا رَسُوْلَ اللهِ اَمْضِ لِمَا أَمَرَكَ اللهُ فَاِنَّا مَعَكَ حَيْثُمَا اَحْبَبْتَ لَا نَقُوْلُ
لَكَ كَمَا قَالَ بَنُوْا إِسْرَائِيْلَ لِمُوْسٰى إِذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا

هَاهُنَا قَاعِدُونَ ، وَلٰكِنْ إِذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُوْنَ مَادَمَتْ عَيْنٌ مِنَّا تَطْرَفُ •

"হে আল্লাহর রসূল। আপনার রব আপনাকে যেদিকে যাবার হুকুম দিচ্ছেন সেদিকে চলুন। আপনি যেদিকে যাবেন আমরা আপনার সাথে আছি। আমরা বনি ইসরাঈলের মতো (মুসা আ.-কে উদ্দেশ্য করে তারা যেভাবে বলেছিল) একথা বলবো না : যাও, তুমি ও তোমার আল্লাহ দু'জনে লড়াই করো, আমরা এখানেই বসে রইলাম।' বরং আমরা বলছি : চলুন আপনি ও আপনার আল্লাহ দু'জনে লড়ুন আর আমরাও আপনাদের সাথে জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই করবো। যতোক্ষণ আমাদের একটি চোখের তারাও নড়াচড়া করতে থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত।"

কিন্তু আনসারদের মতামত না জেনে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিলোনা। কারণ এ পর্যন্ত যেসব সামরিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল তাতে তাদের সাহায্য গ্রহণ করা হয়নি এবং প্রথম দিন তারা ইসলামকে সমর্থন করার যে শপথ নিয়েছিলেন তাকে কার্যকর করতে তারা কতোটুকু প্রস্তুত তা পরীক্ষা করার এটি ছিলো প্রথম সুযোগ। সুতরাং রসূলুল্লাহ সা. সরাসরি তাঁদেরকে সম্বোধন না করে নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। একথায় সা'দ ইবনে মু'আয রা. উঠে বললেন, সম্ভবত আপনি আমাদের সম্বোধন করে বলছেন? জবাব দিলেন : হ্যাঁ। একথা শুনে সা'দ রা. বললেন :

لَقَدْ آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، وَشَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ هُوَ الْحَقّ وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذٰلِكَ عُهُوْدَنَا وَمَوَاثِيْقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَامْضِ بِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ لِمَا أَرَدْتَ فَنَحْنُ مَعَكَ فَوَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوِ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هٰذَا الْبَحْرَ فَخَضْتَهُ لَخَضْنَاهُ مَعَكَ وَمَا تَخَلَّفُ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَمَا نَكْرَهُ أَنْ تَلْقٰى بِنَا عَدُوَّنَا غَدًا إِنَّا لَنَصْبِرُ عِنْدَ الْحَرْبِ صِدْقٌ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَلَعَلَّ اللهُ يُرِيْكَ مِنَّا مَا نُقِرُّ بِهِ عَيْنَكَ فَسَرِّبِنَا عَلٰى بَرَكَةِ اللهِ •

"আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনি যা কিছু এনেছেন তাকে সত্য বলে ঘোষণা করেছি। আপনার কথা শুনার ও আপনার আনুগত্য

করার দৃঢ় শপথ নিয়েছি। কাজেই হে আল্লাহর রসূল! আপনি যা সংকল্প করেছেন তা করে ফেলুন। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন তাহলে আমরাও আপনার সাথে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমাদের একজনও পিছে পড়ে থাকবেনা। আপনি কালই আমাদের নিয়ে দুশমনের সাথে যুদ্ধ শুরু করুন। এটা আমাদের কাছে মোটেই অপছন্দনীয় নয়। আমরা যুদ্ধে অবিচল ও দৃঢ় পদ থাকবো। মোকাবিলায় আমরা সত্যিকার প্রাণ উৎসর্গীতার প্রমাণ দেবো। সম্ভবত আল্লাহ আমাদের থেকে আপনাকে এমন কিছু কৃতিত্ব দেখিয়ে দেবেন, যাতে আপনার চোখ শীতল হবে। কাজেই আল্লাহর বরকতের ভরসায় আপনি আমাদের নিয়ে চলুন।'

এ আলোচনা ও বক্তৃতার পরে সিদ্ধান্ত হলো, বাণিজ্য কালেফার পরিবর্তে কুরাইশ সেনা দলের মোকাবিলা করার জন্যে এগিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু এটা কোনো যেনতেন সিদ্ধান্ত ছিলোনা। এ সংক্ষিপ্ত সময়ে যারা যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন, তাদের সংখ্যা ছিলো তিনশ'র কিছু বেশি (৮৬জন মোহাজির, ৬১ জন আওস গোত্রের এবং ১৭০ জন খাযরাজ গোত্রের)। এদের মধ্যে দু'তিন জনের কাছে ঘোড়া ছিলো। আর বাকি লোকদের জন্যে ৭০টির বেশি উট ছিলনা। এগুলোর পিঠে তাঁরা তিন চারজন করে পালাক্রমে সওয়ার হচ্ছিলেন। যুদ্ধাস্ত্রও ছিলো একেবারেই অপ্রতুল। মাত্র ৬০ জনের কাছে বর্ম ছিলো। এ কারণে গুটিকয় উৎসর্গীত প্রাণ মুজাহিদ ছাড়া এ ভয়ংকর অভিযানে শরিক অধিকাংশ মুজাহিদই হৃদয়ে উৎকণ্ঠা অনুভব করছিলেন। তাঁরা মনে করছিলেন যেনো তারা জেনে বুঝে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিছু সুবিধাবাদী ধরণের লোক ইসলামের পরিসরে প্রবেশ করলেও তারা এমন ইসলামের প্রবক্তা ছিলনা যাতে ধন-প্রাণের সংশয় দেখা দেয়। তারা এ অভিযানকে নিছক পাগলামী বলে অভিহিত করছিল। তারা মনে করছিল, ধর্মীয় আবেগ উচ্ছাস এ লোকগুলোকে পাগলে পরিণত করেছে। কিন্তু রসূল সা. ও তাঁর সাচ্চা-সত্যনিষ্ঠ সাথীগণ একথা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, এটিই প্রাণ উৎসর্গ করার সময়। তাই আল্লাহর উপর ভরসা করে তারা বের হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা সোজা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলেন। এই পথেই কুরাইশদের বাহিনী মক্কা থেকে ধেয়ে আসছিল। অথচ শুরুতে যদি বাণিজ্য কাফেলা লুট করার ইচ্ছা থাকতো তাহলে উত্তর পশ্চিমের পথে এগিয়ে যাওয়া হতো।

রমযান মাসের ১৭ তারিখে বদর নামক স্থানে উভয় পক্ষের মোকাবিলা হলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, তিনজন কাফেরের মোকাবিলায় একজন মুসলমান দাঁড়িয়েছে এবং তাও আবার তারা পুরোপুরি অস্ত্র সজ্জিত নয়। এ অবস্থা দেখে তিনি আল্লাহর সামনে দোয়া করার জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন। অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে ও কান্না বিজড়িত স্বরে তিনি দোয়া করতে থাকলেন :

اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَتَتْ بِخَيْلَائِهَا تُحَاوِلُ أَنْ تُكَذِّبُ رَسُوْلَكَ ، اَللّٰهُمَّ

فَنَصْرَكَ الَّذِيْ وَعَدْتَنِيْ ، اللّٰهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدُ •

অর্থ: "হে আল্লাহ! এই যে কুরাইশরা এসেছে, তাদের সকল ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা নিয়ে তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করতে। হে আল্লাহ! এখন তোমার সেই সাহায্য এসে যাওয়া দরকার, যার ওয়াদা তুমি করেছিলে আমার সাথে। হে আল্লাহ! যদি আজ এ মুষ্টিমেয় দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে এ পৃথিবীতে আর কোথাও তোমার ইবাদত করার মতো কেউ থাকবেনা।"

এ যুদ্ধের ময়দানে মক্কার মোহাজির সাহাবীগণের পরীক্ষা ছিলো সবচেয়ে কঠিন। তাঁদের আপন ভাই-চাচা অন্যান্য তাদের বিরুদ্ধে ময়দানে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারোর বাপ, কারোর ছেলে, কারোর চাচা, কারোর মামা, কারোর ভাই দাঁড়িয়েছিল তার প্রতিপক্ষে। এ যুদ্ধে নিজের কলিজার টুকরার উপর তরবারি চালাতে হচ্ছিল তাঁদের। এধরণের কঠিন পরীক্ষায় একমাত্র তাঁরাই উত্তীর্ণ হতে পারে যারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে হক ও সত্যের সাথে সম্পর্ক জুড়েছে এবং মিথ্যা ও বাতিলের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে পুরোপুরি উদ্যোগী হয়েছে। ওদিকে আনসারদের পরীক্ষাও কিন্তু কম ছিলোনা। এতোদিন তারা মুসলমানদের শুধুমাত্র আশ্রয় দিয়ে কুরাইশ ও তাদের সহযোগী গোত্রগুলোর শত্রুতার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। কিন্তু এবার তো তাঁরা ইসলামের সমর্থনে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিলেন। এর মানে ছিলো, কয়েক হাজার লোকের একটি জনবসতি সমগ্র আরব দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। এ ধরণের দুঃসাহস একমাত্র তাঁরাই করতে পারেন যারা সত্য আদর্শের উপর ঈমান এনে তার জন্যে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে পুরোপুরি জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হতে পারেন। অবশেষে সাহাবায়ে কিরামের অবিচল ঈমান ও সত্যনিষ্ঠা

আল্লাহর সাহায্যের পুরস্কার লাভে সফল হয়ে গেলো। আর নিজেদের সমস্ত অহংকার ও শক্তির অহমিকা সত্ত্বেও কুরাইশ কাফিররা এ সহায় সম্বলহীন জানবাজ সৈনিকদের হাতে পরাজিত হয়ে গেলো। তাদের ৭০ জন নিহত হলো, ৭০ জন বন্দী হলো এবং তাদের সাজসরঞ্জামগুলো গণীমতের সামগ্রী হিসেবে মুসলমানদের দখলে এলো। কুরাইশদের যেসব বড় বড় সরদার তাদের মজলিস গুলজার করে বেড়াতো এবং ইসলাম বিরোধী আন্দোলনে যারা সর্বক্ষণ তৎপর থাকতো তারা এ যুদ্ধে নিহত হলো। এ চূড়ান্ত বিজয় আরবে ইসলামকে একটি উল্লেখযোগ্য শক্তিতে পরিণত করলো। একজন পাশ্চাত্য গবেষক লিখেছেন, "বদর যুদ্ধের আগে ইসলাম ছিলো শুধুমাত্র একটি ধর্ম ও রাষ্ট্র। কিন্তু বদর যুদ্ধের পরে তা রাষ্ট্রীয় ধর্মে বরং নিজেই রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গেলো।" [৭]

তিন : এটা কেবল মুহাম্মদ সা.-এর দৃঢ়তা, অটল সিদ্ধান্ত উন্নত বুদ্ধি ও কৌশল আর সাহাবায়ে কিরামের ত্যাগ ও কুরবানির অদম্য উদ্দীপনারই ফল ছিলো যে, অতি অল্প সময় কালের মধ্যে তাঁরা অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতির গতি সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছেন। আরবদের অর্থনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ মদীনাবাসীদের বাঁচার পথ সংকীর্ণ করে দিয়েছিল। আশপাশের মুশরিক গোত্রসমূহ শত্রুতার সীমাতিক্রম করছিল। স্বয়ং মদিনার অভ্যন্তরেই ইহুদি আর মুনাফিকরা বিষধর সাপের ভুমিকা পালন করছিল। কিন্তু এই সত্য পন্থী ঈমানের পতাকাবাহীরাই রসূলুল্লাহ সা.-এর নেতৃত্বে ক্রমশ এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যার ফলে গোটা আরবে ইসলামের দুর্জয় প্রভাবই শুধু প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরঞ্চ তা অনেক গুণ বেড়ে যায়। [৮]

৭. সাহাবায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্য

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ • الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ • وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ •

"আর সেই মহা পরাক্রমশালী দয়াময়ের উপর ভরসা করো, যিনি তোমাকে সেই সময়ও দেখতে পান যখন তুমি দাঁড়াও। আর তিনি সিজদায় অবনত লোকদের মধ্যে তোমার গতি বিধির উপরও লক্ষ্য রাখেন। (সূরা আশ্ শোয়ারা : আয়াত ২১৭-২১৯)

এখানে 'লক্ষ্য রাখেন' দ্বারা কয়েকটি অর্থ হতে পারে :

এক : তুমি যখন জামায়াতে নামায পড়ার সময় তোমার মোক্তাদীদের সাথে উঠাবসা ও রুকু সিজদা করো, তখনো আল্লাহ তোমাকে দেখে থাকেন।

দুই : তুমি যখন রাত্রি কালে উঠে তোমার সংগি সাথিদের (তাঁদেরকে সিজদায় অবনত লোক বলা হয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্য বুঝানোর জন্যে) দেখে বেড়াও যে, তাদের পরকালের উন্নতির জন্যে তাঁরা কি কি কাজ করছে তখনো তুমি আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে থাকোনা।

তিন : তুমি তোমার সিজদাকারী সংগি সাথিদের নিয়ে আল্লাহর বান্দাদের সংশোধন ও হিদায়াতের উদ্দেশ্যে যে চেষ্টা সাধনা ও তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছো, সে বিষয়ে আল্লাহ্ পূর্ণমাত্রায় ওয়াকিফহাল রয়েছেন।

চার : সিজদাকারী লোকদের পরিচালনার ব্যাপারে তোমার সমস্ত পদক্ষেপ আল্লাহর দৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে। তাদের প্রশিক্ষণ দানের জন্যে, তাদের পবিত্র পরিচ্ছন্ন করার জন্যে এবং কাঁচা ধাতুকে পাকা মুদ্রায় পরিণত করার জন্যে তুমি যা কিছু করছো, তা সবই আল্লাহর জানা রয়েছে।

এখানে রসূলুল্লাহ সা.-এবং সাহাবায়ে কিরামের এইসব গুণ বৈশিষ্ট্য যে উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, পূর্ব ও পরের বক্তব্যের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে। পূর্বের কথার সাথে সম্পর্কের দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হলো, প্রকৃত পক্ষে তুমি আল্লাহর রহমত এবং অফুরন্ত সাহায্য সহযোগিতা লাভের অধিকারী। কারণ আল্লাহ্ তো কোনো অন্ধ-কালা মাবুদ নন। তিনি তো সবই দেখেন, সবই শুনেন। তাঁর পথে তোমার যাবতীয় চেষ্টা সংগ্রাম এবং তোমার সিজদায় অবনত সাথিদের মাঝে তোমার তৎপরতা, সবই তাঁর দৃষ্টিপথে রয়েছে।

আর পরবর্তী বক্তব্যের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, যার জীবন হবে মুহাম্মদ সা.-এর মতো আর যার সংগি সাথিদের গুণ বৈশিষ্ট্য হবে মুহাম্মদ সা.-এর সংগি সাথিদের মতো- তার উপর জিনের আছর হয়েছে কিংবা তিনি একজন কবিয়াল- এসব কথা কেবল নির্বোধ বা অন্ধ ব্যক্তিরাই বলতে পারে। জ্বিন-শয়তান যেসব গণৎকারের উপর আছর করে এবং কবিয়াল ও তার সংগি সাথিদের যেরূপ চালচলন হয়ে থাকে- তা কারো অজানা নয়। এ ধরণের লোক তোমাদের সমাজেই অনেক আছে। মুহাম্মদ সা. ও তাঁর সংগি সাথি আর কবি ও গণৎকারদের জীবন ধারায় কোনো পার্থক্য নেই- এমন কথা কোনো ব্যক্তি ঈমানদারীর সাথে বলতে পারে কি? এরপরও

আল্লাহর এই নেক বান্দাহদের প্রতি গণক ও কবি হওয়ার প্রকাশ্য অভিযোগ আরোপ করা হচ্ছে- এটা কতো বড় ধৃষ্টতা! এজন্যে কি কারো বিন্দুমাত্র লজ্জা হয়না?[৯]

৮. সাহাবায়ে কিরামের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করার ভ্রান্তি

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ •

অর্থ: আল্লাহ নিজের কাজের জন্যে তোমাদের বাছাই করেছেন এবং তোমাদের জন্যে দীনের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। (সূরা হজ্জ : আয়াতাংশ ৭৮)

এখানে এই বিষয়ে সাবধান করে দেয়াও জরুরি যে, কুরআনের যেসব আয়াত দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদার কথা প্রমাণিত হয়, এই আয়াতটি (সূরা হজ্জের শেষ আয়াত) তন্মধ্যে একটি। যারা সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করে- এসব আয়াত তাদের ভ্রান্তি প্রমাণ করে। কারণ এ আয়াত যাদের সরাসরি সম্বোধন করছে, তাঁরা হলেন সাহাবায়ে কিরাম রা.। অন্য লোকেরা এই সম্বোধনে শামিল হয়েছে তাঁদের পরে।[১০]

৯. সাহাবায়ে কিরামের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা নিষেধ

এ আয়াতে মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষাও দেয়া হয়েছে। তাহলো, কোনো মুসলমানের মনে অপর কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকা উচিত নয়। আর মুসলমানদের জন্যে সঠিক জীবনাচার হলো, তারা তাদের পূর্ববর্তী মুসলমান ভাইদের লা'নত বা অভিশাপ দেবেনা কিংবা তাদের সাথে সম্পর্কহীনতার কথা বলবেনা। বরং তাদের মাগফিরাতের জন্যে দোয়া করতে থাকবে। যে বন্ধন মুসলমানদের পরস্পর সম্পর্কিত করেছে তা হলো ঈমানের বন্ধন। কোনো ব্যক্তির অন্তরে অন্যসব জিনিসের চেয়ে ঈমানের গুরুত্ব যদি অধিক হয় তাহলে যারা ঈমানের বন্ধনের ভিত্তিতে তার ভাই, সে অনিবার্যভাবেই তাদের কল্যাণকামী হবে। তাদের জন্যে অকল্যাণ, হিংসা-বিদ্বেষ এবং ঘৃণা কেবল তখনই তার অন্তরে স্থান পেতে পারে যখন ঈমানের মূল্য ও মর্যাদা তার দৃষ্টিতে কমে যাবে এবং অন্য কোনো জিনিসকে তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করবে। তাই ঈমানের সরাসরি দাবি, একজন মু'মিনের অন্তরে অন্য কোনো মু'মিনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও হিংসা-বিদ্বেষ থাকবেনা। নাসায়ী কর্তৃক আনাস রা. বর্ণিত একটি হাদিস থেকে এ ক্ষেত্রে উত্তম শিক্ষা লাভ করা যায়। তিনি বর্ণনা

করেছেন, এক সময় রসূলুল্লাহ সা.-এর মজলিসে একাধারে তিন দিন একটি ঘটনা ঘটতে থাকলো। রসূলুল্লাহ সা. বলতেন :

"এখন তোমাদের সামনে এমন এক ব্যক্তির আগমণ ঘটবে যে জান্নাতের অধিবাসী। আর প্রত্যেকবারই আনসারদের কোনো একজন হতেন সেই আগন্তুক। এতে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের মধ্যে কৌতূহল দেখা দিলো যে, তিনি এমন কি কাজ করেন যার ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ সা. তাঁর সম্পর্কে বার বার এই সুসংবাদ দান করলেন। সুতরাং তার ইবাদতের অবস্থা দেখার জন্যে একটা উপলক্ষ সৃষ্টি করে তিনি পরপর তিন দিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে রাত কাটাতে থাকলেন। কিন্তু রাতের বেলা তিনি কোনো প্রকার অস্বাভাবিক কাজকর্ম দেখতে পেলেন না। বাধ্য হয়ে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : ভাই, আপনি এমন কি কাজ করেন, যে কারণে রসূলুল্লাহ সা.-এর মুখে আপনার সম্পর্কে এই বিরাট সুসংবাদ শুনেছি। তিনি বললেন : আমার ইবাদত-বন্দেগীর অবস্থা তো আপনি দেখেছেন। তবে একটি বিষয় হয়তো এর কারণ হতে পারে। আর তা হলো :

لَا اَجِدُ فِىْ نَفْسِىْ غِلًّا لِاَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا اَحْسَدُهُ عَلَى خَيْرٍ

اَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى اِيَّاهُ •

"আমি আমার মনের মধ্যে কোনো মুসলমানের জন্যে বিদ্বেষ পোষণ করিনা এবং মহান আল্লাহ তাকে যে কল্যাণ দান করেছেন সে জন্যে তাকে হিংসাও করিনা।"

তবে এর মানে এ নয় যে, কোনো মুসলমান অন্য কোনো মুসলমানের কথা ও কাজে যদি কোনো ত্রুটি দেখতে পান তাহলে তাকে তিনি ত্রুটি বলবেন না। কোনো ঈমানদার ভুল করলেও সেটাকে ভুল না বলে শুদ্ধ বলতে হবে কিংবা তার ভ্রান্ত কথাকে ভ্রান্ত বলা যাবেনা, ঈমানের দাবি কখনো তা নয়। কিন্তু কোনো জিনিসকে প্রমাণের ভিত্তিতে ভুল বলা এবং ভদ্রতা রক্ষা করে তা প্রকাশ করা এক কথা আর শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা, নিন্দাবাদ ও কুৎসা রটনা করা এবং গালমন্দ করা আরেক কথা। সমসাময়িক জীবিত লোকদের বেলায়ও এরূপ আচরণ করা হলে তা একটি বড় অন্যায়। কিন্তু পূর্বের মৃত লোকদের সাথে এরূপ আচরণ করলে তা আরো বড় অন্যায়। কারণ, এরূপ মন ও মানসিকতা এমনই নোংরা যে, তা মৃতদেরও ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়।

এর চেয়েও বড় অন্যায় হলো, সেই সব মহান ব্যক্তি সম্পর্কে কটূক্তি করা যারা অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সময়ে রসূলুল্লাহ সা.-এর বন্ধুত্ব ও সহচার্যের হক আদায় করেছিলেন এবং নিজেদের জীবন বিপন্ন করে পৃথিবীতে ইসলামের আলোর বিস্তার ঘটিয়েছিলেন যার বদৌলতে আজ আমরা ঈমানের নিয়ামত লাভ করেছি। তাদের মাঝে যেসব মতানৈক্য হয়েছে সে ক্ষেত্রে কেউ যদি এক পক্ষকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করে এবং অপর পক্ষের ভূমিকা তার মতে সঠিক না হয় তাহলে সে এরূপ মত পোষণ করতে পারে এবং যুক্তির সীমার মধ্যে থেকে তা প্রকাশ করতে বা বলতেও পারে। কিন্তু এক পক্ষের সমর্থনে এতোটা বাড়াবাড়ি করা যে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষে মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং কথা ও লেখনীর মাধ্যমে গালি দিতে ও নিন্দাবাদ ছড়াতে থাকার এটা এমন একটা আচরণ যা কোনো আল্লাহভীরু মানুষের দ্বারা হতে পারেনা। কুরআনের স্পষ্ট শিক্ষার পরিপন্থী এ আচরণ যারা করে তারা তাদের এ আচরণের সমর্থনে যুক্তি পেশ করে যে, কুরআন মু'মিনদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করতে নিষেধ করে। কিন্তু আমরা যাদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করি তারা মুমিন নয় বরং মুনাফিক। কিন্তু যে গুনাহর সপক্ষে সাফাই ও ওযর হিসেবে এ অপবাদ পেশ করা হয়ে থাকে তা ঐ গোনাহর চেয়েও জঘন্য। কুরআন মজিদের এ আয়াতগুলোই তাদের এ অপবাদ খণ্ডন ও প্রত্যাখানের জন্যে যথেষ্ট। কারণ এ আয়াতগুলোর বর্ণনাধারার মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা পরবর্তীকালের মুসলমানদেরকে তাদের পূর্ববর্তী ঈমানদারদের সাথে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ না রাখতে এবং তাদের জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করতে শিক্ষা দিয়েছেন।[১১]

যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরামকে মন্দ বলে, আমার মতে সে কেবল ফাসেকই নয়, বরঞ্চ তার ঈমানই সংশয়পূর্ণ। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

مَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِى اَبْغَضَهُمْ •

"যে আমার সাথিদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।"[১২]

১০. সাহাবীর মর্যাদায় মুয়াবিয়া রা.

সলফে সালেহীনের মধ্যে যদিও সাহাবীর সংজ্ঞা নিয়ে মত পার্থক্য ছিলো, কিন্তু যে কোনো সংজ্ঞা অনুযায়ী মুয়াবিয়া রা. সাহাবীর মর্যাদা লাভ

করেছিলেন। তাঁর কোনো কোনো ব্যক্তিগত কাজ হয়তো ভেবে দেখার বিষয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁর খেদমত ও অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর মাগফিরাত ও পুরস্কার লাভ নিশ্চিত ব্যাপার।[১৩]

১১. সাহাবায়ে কিরামের জন্যে মাগফিরাতের সুসংবাদ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে, তাদের জন্যে আল্লাহ মাগফিরাত আর মহা পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন।" (আল ফাতাহ : শেষ আয়াত)

কিছু সংখ্যক লোক এ আয়াতের مِنْهُم শব্দটির অর্থ করেছেন : তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ।' আর তারা গোটা আয়াতের অর্থ করেছেন এ ভাষায় : তাদের মধ্য থেকে যেসব লোক ঈমান এনেছে, আর যারা নেক আমল করেছে- আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি ক্ষমা ও বড় শুভ প্রতিফলের ওয়াদা করেছেন।" এরূপ তরজমা করেই এ লোকেরা সাহাবায়ে কিরামের উপর ভর্ৎসনা করার সুযোগ বের করেছেন এবং তারা ধৃষ্টতার সাথে দাবি করেছেন যে : এ আয়াতের দৃষ্টিতেই সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বহু লোক মুমিন ও নেক আমলকারী ছিলেন না।" কিন্তু এরূপ তফসির করা এ সূরারই ৪,৫,১৮ এবং ২৬ নম্বর আয়াতের বিপরীত অর্থ গ্রহণের শামিল। তাছাড়া এ আয়াতেরই প্রাথমিক অংশের সাথে এরূপ অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ৪ ও ৫ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে যারা রসূলুল্লাহ সা. এর সংগি সাথি ছিলেন, সেইসব সাহাবীর দিলে পরম শান্তি স্বস্তি নাযিলের এবং তাদের ঈমান প্রবৃদ্ধি হবার কথা উল্লেখ করেছেন। আর তাদের সকলকেই জান্নাতে প্রবেশ করার সুসংবাদ দিয়েছেন। ১৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা গাছের নিচে রসূলুল্লাহ সা.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণকারী সমস্ত সাহাবীর প্রতি স্বীয় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে কাউকেও বাদ দিয়ে কথা বলা হয়নি। ২৬ আয়াতে রসূলুল্লাহ সা.-এর সকল সংগি সাথির ব্যাপারে 'মুমিনীন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁদের সকলের প্রতি স্বীয় শান্তি-স্বস্তি ও প্রশান্তি নাযিল করার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : এই লোকেরা তাকওয়ার বাণী যথার্থভাবে পালন করার অধিকতর হকদার (উপযুক্ত)। এখানেও একথাটি এভাবে বলা হয়নি যে, তাদের মধ্যে যারা মুমিন, কেবল তাদেরই জন্যে এ

খবর দেয়া হয়েছে। তাছাড়া আলোচ্য আয়াতটিরও প্রথমাংশে পরিচিতিমূলক যে কথা বলা হয়েছে, তাতে রসূলুল্লাহ সা.-এর সব কজন সাহাবী সম্পর্কেই নির্বিশেষে তাদের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে এ বাক্যাংশগুলোতে। বলা হয়েছে, যারাই তার সংগে রয়েছেন তাদেরই পরিচিতি এই ....। অতপর সর্বশেষ বাক্যে এসে "তাদের মধ্যে কিছু লোক মুমিন ও নেককার ছিলেন আর কিছু লোক নয়" .... সহসা এরূপ কথা বলার কি অবকাশ থাকতে পারে? এসব কারণে مِنْهُمْ শব্দের مِنْ এর অর্থ 'কিছু লোক' করাটা বক্তব্য প্রণালীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আসলে এখানে مِنْ ব্যাখ্যামূলক শব্দ। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ (মুর্তিগুলোর পংকিলতা পরিহার করে চলো) এখানে مِنْ কিছু অংশ বুঝানোর জন্যে নয় বরঞ্চ এ مِنْ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যামূলক শব্দ। তা না হলে এ আয়াতটির অর্থ করতে হবে এরূপ : মুর্তি দেবতাগুলোর মধ্যে যেগুলো পংকিল কেবল সেগুলো থেকেই দূরে থাকো।"[১৪]

১২. হকের পথে সাহাবায়ে কিরামের উৎসাহ উদ্দীপনা

নিষ্ঠাবান মুমিনরা অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, যে দাওয়াত ও আন্দোলনের জন্যে তারা বিগত বাইশটি বছর প্রাণপণ হয়ে রয়েছেন, এখন তারি ভাগ্য চূড়ান্তভাবে নির্ধারণের মুহূর্ত এসে পৌঁছেছে। এ সময় সাহসিকতার সাথে এগিয়ে যাবার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এ হবে যে গোটা দুনিয়ায় এ দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ার দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। আর এ সময় দুর্বলতা দেখানোর অর্থ হবে- মূল আরব ভুখন্ডেও এ দাওয়াত তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে। এ মনোভাব নিয়ে নিষ্ঠাবান মুমিনরা পূর্ণোদ্যম যুদ্ধের প্রস্তুতিতে আত্ম নিয়োগ করলেন। সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহের ব্যাপারে প্রত্যেকেই অপরের তুলনায় বেশি অংশগ্রহণে তৎপর হলেন। উসমান রা. এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করলেন। উমর রা. নিজের সমগ্র জীবনের উপার্জনের অর্ধেক এনে পেশ করলেন। আবু বকর রা. নিজের সমস্ত সম্পদ উৎসর্গ করলেন। দরিদ্র সাহাবীরা মেহনত মজুরি করে যা কিছু পেলেন তা সবই এনে দিলেন। মহিলা সাহাবীরা নিজেদের অলংকার খুলে দিলেন। প্রাণোৎসর্গকারী স্বেচ্ছাসেবীদের বাহিনী চতুর্দিক থেকে এসে জমায়েত হতে লাগলো। তারা দাবি করলো, অস্ত্র ও সওয়ারীর ব্যবস্থা হলে আমরা আমাদের জীবন

উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। যারা যানবাহন পাননি তারা কান্নাকাটি করতে লাগলেন এবং এমনভাবে নিজেদের হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে লাগলেন, যা দেখে রসূলুল্লাহ সা.-এর মন ব্যাকুল হয়ে উঠে।[১৫]

১৩. সাহাবায়ে কিরামের অসাধারণ ঈমানী নিষ্ঠার প্রমাণ

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا •

অর্থ: আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, যখন তারা গাছের নিচে তোমার নিকট বাইয়াত করছিল। তাদের মনের অবস্থা তাঁর জানা ছিলো। তাই তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন। আর পুরস্কার হিসেবে তিনি তাদের নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন।" (সূরা আল ফাতাহ : আয়াত ১৮)

এখানে হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে সাহাবায়ে কিরামের নিকট থেকে গৃহীত বায়াতের কথা পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই বাইয়াতকে বলা হয় 'বাইয়াতে রিদওয়ান'। কেননা আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে সুসংবাদ শুনিয়েছেন যে, তিনি সেই লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যারা এই বিপদ সংকুল সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়নি। বরং রসূলুল্লাহ সা.-এর হাতে আত্মদানের বাইয়াত করার মাধ্যমে নিজেদের নিষ্ঠাবান ঈমানদার হবার অকাট্য প্রমাণ পেশ করেছে। সময়টা এতোই নাজুক ছিলো যে, মুসলমানরা একেকজন মাত্র একেকখানা তলোয়ার নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন মাত্র চৌদ্দশ'। সামরিক সাজসজ্জাও তাদের ছিলোনা। কেবলমাত্র ইহরামের চাদরে তাদের দেহ আবৃত্ত ছিলো। তারা এখানে তাদের সামরিক প্রাণ কেন্দ্র থেকে আড়াইশত মাইল দূরে অবস্থান করছিলেন আর শত্রু পক্ষের লীলা ভুমি (মক্কা) মাত্র তের মাইল দূরে ছিলো। সেখান থেকে তারা সকল প্রকার সাহায্য লাভ করতে পারতো। আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর দীনের প্রতি এই লোকদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা যদি এক বিন্দুও কম থাকতো তাহলে এই কঠিন বিপদ ও সংকটকালে তারা রসূলুল্লাহ সা.-এর সংগ ও সহচর্য ত্যাগ করে চলে যেতেন এবং ইসলামের অগ্রগতি চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যেতো। তাদের নিজেদের ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা ছাড়া বাহ্যিক চাপ এমন আর কিছুই ছিলোনা যদ্দরুন তারা এরূপ বাইয়াত গ্রহণে বাধ্য

হতে পারতেন। আল্লাহর দীনের জন্যে এ কঠিন বিপদসংকুল সময় মৃত্যুবরণ ও শত্রুনিধনে তাদের দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হওয়া অকাট্যভাবে একথার প্রমাণ করে যে, তারা নিজেদের ঈমানে নিষ্ঠাবাণ এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যে আত্মোৎসর্গ ভাবধারার পূর্ণ ও উচ্চতর মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে স্বীয় সন্তুষ্টির এই সনদ দান করলেন। আল্লাহর নিকট থেকে সন্তুষ্টির সনদ লাভ করার পর কেউ যদি তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় কিংবা তাঁদের প্রতি রূঢ় ও গালাগালের ভাষা প্রয়োগ করে, তবে তারা তাঁদের সাথে নয় স্বয়ং আল্লাহ তায়ালারই সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে বলে মনে করতে হবে। একথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে গিয়ে যদি কেউ বলে আল্লাহ তায়ালা যখন তাদেরকে সন্তুষ্টির সনদ দিয়েছিলেন তখন তো তারা অবশ্যি নিষ্ঠাবান ছিলেন; কিন্তু পরবর্তী কালে তারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি নিষ্ঠাহীন হয়ে গিয়েছিলেন- তবে বলতে হবে যে এসব লোক সম্ভবত আল্লাহর প্রতি এক কঠিন ভুল ধারণায় নিমজ্জিত। তারা হয়তো মনে করছে এ আয়াতটি নাযিল করার সময় আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতেন না। তাই শুধু সে সময়কার অবস্থা দেখেই তিনি তাদেরকে এই সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন। আর সম্ভবত এই ভবিষ্যত না জানার ফলেই এই সুসংবাদটি তাঁর পবিত্র কিতাবেও শামিল করে দিয়েছেন। যাতে উত্তরকালেও যখন তারা নিষ্ঠাহীন হয়ে পড়বে, দুনিয়ার লোকেরা তখনো তাদের সম্পর্কিত এই আয়াতটি পাঠ করতে থাকে। আর নাউযুবিল্লাহ এই নিষ্ঠাহীন লোকদের যে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট দিয়েছেন তার এরূপ ইলমে গায়েবের লক্ষণ দেখে তারা বিদ্রুপ করতে থাকে। বস্তুত এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও যুক্তিহীন।[১৬]

১৪. তারা ছিলেন ইসলামী শাসনের বাস্তব নমুনা

রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদান এবং কার্যকর নেতৃত্বের দ্বারা যে সমাজের অভ্যুদয় ঘটেছিল, তার প্রতিটি সদস্যই জানতো ইসলামের বিধি বিধান ও প্রাণসত্তা অনুযায়ী কোন্ ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত। স্বীয় স্থলাভিষিক্তির ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সা. কোনো ফায়সালা দিয়ে না গেলেও মুসলিম সমাজের সদস্যরা একথা ভালোভাবেই জানতো যে, ইসলাম একটি শূরা ভিত্তিক খেলাফত দাবি করে। এ জন্যেই সেখানে কোনো বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কোনো ব্যক্তি বলপ্রয়োগে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হননি। খেলাফত লাভের জন্যে নিজের পক্ষ

থেকে কেউ কোনো প্রকার চেষ্টা তদবির করেননি। এমনকি নামমাত্র প্রচেষ্টাও সেজন্যে চালাননি। বরঞ্চ জনগণ তাদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে পরপর চারজন সাহাবীকে তাদের খলিফা নির্বাচিত করে। মুসলিম উম্মাহ এ খিলাফতকে "খিলাফতে রাশেদা" (সত্যাশ্রয়ী খিলাফত) বলে আখ্যায়িত করেছে। এ থেকে একথা আপনা আপনিই প্রকাশিত হয় যে, মুসলমানদের দৃষ্টিতে এটিই ছিলো খিলাফতের সঠিক পন্থা।[১৭]

১৫. আনসার সাহাবীগণের মহৎ গুণাবলি

এটা মদিনা তাইয়্যেবার আনসারদের পরিচয় ও প্রশংসা। মুহাজিরগণ মক্কা ও অন্যান্য স্থান থেকে হিজরত করে তাঁদের শহরে আসলে তাঁরা রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে প্রস্তাব দিলেন, আমাদের বাগবাগিচা ও খেজুর বাগান দিয়ে দিচ্ছি। আপনি ওগুলো আমাদের এবং এসব মুজাহির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : এসব লোক তো বাগানের কাজ জানেনা। তারা এমন এলাকা থেকে এসেছে যেখানে বাগান নেই। এমন কি হতে পারেনা, এসব বাগ-বাগিচা ও খেজুর বাগানে তোমরাই কাজ করো এবং উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ এদের দাও। তারা বললো : আমরা মেনে নিলাম। (বুখারি, ইবনে জরির) এতে মুহাজিরগণ বলে উঠলেন : এ রকম আত্মত্যাগী মানুষ তো আর কখনো দেখিনি। এরা নিজের কাজ করবে অথচ আমাদের এর অংশ দেবে। আমাদের তো মনে হচ্ছে সমস্ত সওয়াব তারাই নিয়েছে। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তা নয়, যতোক্ষণ তোমরা তাদের প্রশংসা করতে থাকবে এবং তাদের কল্যাণের জন্যে দোয়া করবে ততোক্ষণ তোমরাও সওয়াব পেতে থাকবে। (মুসনাদে আহমদ) অতপর বনী নাযীরের এলাকা বিজিত হলে রসূলুল্লাহ সা. বললেন : এখন একটা বন্দোবস্ত হতে পারে এভাবে যে, তোমাদের বিষয়-সম্পদ এবং ইহুদিদের পরিত্যক্ত ফল-ফলাদি ও খেজুর বাগান মিলিয়ে একত্রিত করে সবটা তোমাদের ও মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া যাক। আরেকটা বন্দোবস্ত হতে পারে এভাবে যে, তোমরা তোমাদের বিষয়-সম্পদ নিজেরাই ভোগ দখল করো আর পরিত্যক্ত এসব ভূমি মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া যাক। আনসারগণ বললেন : এসব বিষয়-সম্পদ আপনি তাদের মধ্যে বিলি বন্টন করে দিন। আর আপনি চাইলে আমাদের বিষয়-সম্পদেরও যতোটা ইচ্ছা তাদের দিয়ে দিতে পারেন। এতে আবু বকর রা. চিৎকার করে উঠলেন :

جَزَاكُمُ اللّٰهُ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ خَيْرًا

" হে আনসারগণ! আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন।" (ইয়াহইয়া ইবনে আদম, বালাযুরি)

এভাবে আনসারদের সম্মতির ভিত্তিতেই ইহুদিদের পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হলো। আনসারদের মধ্যে থেকে শুধু আবু দুজানা রা., সাহল ইবনে সা'দ রা. এবং কারো কারো বর্ণনা অনুসারে হারেস ইবনুস সিমা রা.-কে অংশ দেয়া হলো। কারণ, তাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। (বালাযুরি, ইবনে হিশাম, রূহুল মু'আনি)

বাহরাইন এলাকা ইসলামি রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হলে সে সময়ও আনসারগণ এই ত্যাগের প্রমাণ দেন। রসূলুল্লাহ সা. ঐ অঞ্চলের বিজিত ভূমি শুধু আনসারদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। কিন্তু আনসারগণ বললেন: যতোক্ষণ আমাদের সমপরিমাণ অংশ আমাদের ভাই মুহাজিরদের দেয়া না হবে ততোক্ষণ আমরা এ সম্পদের কোনো অংশ গ্রহণ করবোনা। (ইয়াহইয়া ইবনে আদম)। আনসারদের এসব ত্যাগের কারণে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রশংসা করেছেন।[১৮]

১৬. রসূলুল্লাহ সা. এবং সাহাবায়ে কিরামের সঠিক মর্যাদা

মানব সমাজে নবীর স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত নাজুক। একটি সাধারণ কথা যা অন্য কোনো মানুষের জীবনে সংঘটিত হলে তা তেমন কোনো গুরুত্বই বহন করেনা, কিন্তু অনুরূপ ঘটনাই নবীর জীবনে সংঘটিত হলে আইনের মর্যাদা লাভ করে। তাই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নবী-রসূলদের জীবন পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে তাদের অতি ক্ষুদ্র কোনো পদক্ষেপও আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী না হয়। নবীর দ্বারা এমন কোনো ক্ষুদ্র কাজও সংঘটিত হয়ে গেলে সংগে সংগে তা সংশোধন করে দেয়া হয়েছে, যাতে ইসলামি আইন ও তার উৎস সম্পূর্ণ বিশুদ্ধরূপে শুধু আল্লাহর কিতাব আকারে নয় বরং নবীর "উসওয়ায়ে হাসানা" বা উত্তম জীবন আদর্শরূপেও আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌঁছে এবং তার মধ্যে অণু পরিমাণও এমন কোনো জিনিস সংমিশ্রিত হতে না পারে, আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জির সাথে যার কোনো মিল নেই।

উপরে বর্ণিত মূলনীতির আলোকে আপনা থেকেই যে বিষয়টি বুঝা যায় তা এই যে, একটি ক্ষুদ্র বিষয়েও যখন রসূলুল্লাহ সা.-কে ভুল দেখিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তা শুধু সংশোধনই করা হয়নি, বরং রেকর্ডভুক্তও করা হয়েছে তখন তা অকাট্যভাবে আমাদের মনে এ আস্থা সৃষ্টি করে যে, নবীর পবিত্র

জীবনকালের যেসব কাজকর্ম ও হুকুম-আহকাম বর্তমানে আমরা পাচ্ছি এবং যেসব কাজকর্ম ও হুকুম আহকাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো তিরস্কার বা সংশোধনী রেকর্ডে নেই তা পুরোপুরি সত্য ও নির্ভুল এবং আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পূর্ণরূপে সংগতিপূর্ণ। ঐসব কাজকর্ম ও আদেশ নিষেধ থেকে আমরা পূর্ণ আস্থার সাথে হিদায়াত ও পথনির্দেশ গ্রহণ করতে পারি।

কুরআন মজিদের এই বাণী থেকে চতুর্থ যে বিষয়টি সামনে আসে তা হচ্ছে, যে পবিত্র রসূলের সম্মান ও মর্যাদাকে আল্লাহ নিজে বান্দাদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে গণ্য করেন সেই রসূল সম্পর্কে এ সূরাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর স্ত্রীদের খুশি করার জন্যে একবার আল্লাহর হালালকৃত একটি জিনিসকে নিজের জন্যে হারাম করে নিয়েছিলেন। আর রসূলের পবিত্র স্ত্রীগণ, আল্লাহ নিজে যাদেরকে ঈমানদার মা বলে ঘোষণা করেন এবং যাঁদেরকে সম্মান করার জন্যে তিনি নিজে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন, কিছু ভুল-ত্রুটির জন্যে তাঁদেরকেই আবার তিনি কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তাছাড়া রসূলকে তিরস্কার এবং তাঁর স্ত্রীদেরকে সাবধান চুপিসারে করা হয়নি, বরং তা সেই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা সমস্ত উম্মতকে চিরদিন পড়তে হবে। আল্লাহ তা'আলার এরূপ কোনো অভিপ্রায় ছিলোনা, কিংবা থাকতেও পারেনা। একথাও স্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআনের এ সূরা পাঠ করে কোনো মুসলমানের অন্তর থেকে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা উঠে যায়নি। তাহলে কুরআনে এ কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে তাঁদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মান প্রদর্শনের সঠিক সীমারেখার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চান। নবীগণ কেবল নবীই, তাঁরা খোদা নন যে, তাঁদের কোনো ভুল-ত্রুটি হতে পারেনা। নবীর মর্যাদা এ কারণে নয় যে, তাঁর কোনো ভুল-ত্রুটি হওয়া অসম্ভব। বরং নবীর মর্যাদা এ কারণে যে, তিনি আল্লাহর ইচ্ছার পূর্ণাঙ্গ বাস্তব রূপ। তাঁর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভুল-ত্রুটিকেও আল্লাহ সংশোধন না করে ছেড়ে দেননি। এভাবে আমরা এ আস্থা ও প্রশান্তি লাভ করি যে, রসূলের রেখে যাওয়া আদর্শ আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তব প্রতিনিধিত্ব করছে। একইভাবে সাহাবায়ে কিরাম হোন বা রসূলের সা. পবিত্র স্ত্রীগণ হোন, তাঁরা সবাই মানুষ ছিলেন, ফেরেশতা বা মানব সত্তার উর্ধ্বে কিছু

ছিলেননা। তাদেরও ভুল-ত্রুটি হওয়া সম্ভব ছিলো। তাঁরা যে মর্যাদা লাভ করেছিলেন তার কারণ ছিলো এই যে, আল্লাহর রসূলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তাঁদেরকে মানবতার সর্বোত্তম নমুনা বানিয়ে দিয়েছিল। তাঁদের যা কিছু সম্মান ও মর্যাদা তা এ কারণেই। তাঁরা ভুল-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এরূপ অনুমান ও মনগড়া ধারণার উপর তাদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত নয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ সা.-এর কল্যাণময় যুগে সাহাবায়ে কিরাম কিংবা রসূল সা.-এর পবিত্র স্ত্রীগণের দ্বারা মানবিক দুর্বলতার কারণে যখনই কোনো ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে তখনই তাদের সতর্ক করা হয়েছে ও ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। রসূল সা. নিজেও তাদের কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি সংশোধন করেছেন যা হাদিস গ্রন্থেসমূহের বহু সংখ্যক জায়গায় উল্লেখ আছে। আল্লাহ তায়ালা নিজেও কুরআন মজিদে তাঁদের কিছু কিছু ভুল-ত্রুটির উল্লেখ করে তা সংশোধন করেছেন, যাতে মুসলমানগণ কখনই তাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মান দেখানোর এমন কোনো অতিরঞ্জিত ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে না নেয় যা তাঁদেরকে মানুষের পর্যায় থেকে উঠিয়ে আল্লাহর মর্যাদায় বানিয়ে না দেয়। আপনি যদি চোখ খুলে কুরআন মজিদ অধ্যয়ন করেন তাহলে আপনার সামনে এর দৃষ্টান্ত একের পর এক আসতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা সূরা আলে ইমরানে ওহুদ যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে সাহাবা কিরামদের সম্বোধন করে বলেছেন: "আল্লাহ তায়ালা (সাহায্য সহযোগিতার) যে প্রতিশ্রুতি তোমাদের দিয়েছিলেন তা তিনি পূরণ করেছেন যখন তোমরা তাদেরকে তাঁর ইচ্ছায় হত্যা করছিলে। অবশেষে তোমরা যখন দুর্বলতা দেখালে এবং কাজের ব্যাপারে মতানৈক্য করলে আর যে জিনিসের আকাংখা তোমরা করছিলে আল্লাহ তা'য়ালা যে মাত্র তোমাদের সেই জিনিস দেখালেন (অর্থাৎ গনীমতের সম্পদ) তখনই তোমরা তার হুকুমের নাফরমানি করে বসলে। তোমাদের মধ্যে কেউ ছিলো পার্থিব স্বার্থের প্রত্যাশী এবং কেউ ছিলে আখেরাতের প্রত্যাশী। এ অবস্থায় তোমাদের পরীক্ষার জন্যে আল্লাহ তাদের মোকাবেলায় তোমাদের পরাস্ত করে দিলেন। আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ও মেহেরবান।" (আয়াত ১৫২)

অনুরূপভাবে সূরা নূরে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর বিরুদ্ধে অপবাদের উল্লেখ করে সাহাবীগণকে বলেন :

"এমনটা কেন হলো না যে, যখন তোমরা এ বিষয়টি শুনেছিলে মুমিন নারী ও পুরুষ সবাই নিজে সে বিষয়ে ভালো ধারণা পোষণ করতে এবং বলে দিতে যে, এটা স্পষ্ট অপবাদ। .... দুনিয়া ও আখেরাতে যদি তোমাদের উপর আল্লাহর মেহেরবানী ও দয়া না হতো তাহলে যে বিষয়ের মধ্যে তোমরা নিক্ষিপ্ত হয়েছিলে তার পরিণামে কঠিন আযাব তোমাদের গ্রাস করতো। একটু ভেবে দেখো, যখন তোমাদের মুখে মুখে কাহিনীটার চর্চা হচ্ছিল এবং তা ছড়াচ্ছিল এবং তোমরা এমন কিছু বলছিলে যে বিষয়ে তোমাদের কিছুই জানা ছিলনা। তোমরা এটাকে একটা মামুলি ব্যাপার মনে করছিলে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তা ছিলো গুরুতর বিষয়। কেন তোমরা এ কথা শোনামাত্র বললে না যে, আমাদের জন্যে এরূপ কথা মুখে আনাও শোভা পায়না। সুবহানাল্লাহ! এটা তো একটা গুরুতর অপবাদ? আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো যেন তোমরা এরূপ আচরণ না করো।" (সূরা নূর : আয়াত ১২-১৭)

সূরা আহযাবে রসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে : "হে নবী, তোমার স্ত্রীদের বলো, তোমরা যদি দুনিয়া ও তার চাকচিক্য চাও তাহলে এসো আমি তোমাদের কিছু দিয়ে উত্তম রূপে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আখেরাতের প্রত্যাশী হয়ে থাকো তাহলো জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্যে বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা আহযাব : আয়াত ২৮-২৯)

সূরা জুম'আতে সাহাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : "তারা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও খেল তামাশা দেখে সে দিকে ছুটে গেলো এবং (হে নবী) তোমাকে (খোতবা দানরত অবস্থায়) দণ্ডায়মান রেখে গেলো। তাদের বলো, আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।" (আয়াত ১১)

মক্কা বিজয়ের পূর্বে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হাতেব ইবনে আবী বালতায়া রসূলুল্লাহ সা.-এর মক্কা অভিযানের খবর গোপনে কুরাইশদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সূরা মুমতাহিনায় তাঁর এ কাজের কঠোর সমালোচনা ও তিরস্কার করা হয়েছে।

কুরআন মজিদের মাধ্যমেই এসব উদাহরণ বর্তমান, যে কুরআন মজিদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা সাহাবা কিরাম এবং রসূলের পবিত্র স্ত্রীগণের সম্মান ও মর্যাদা নিজে বর্ণনা করেছেন এবং তাদেরকে রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়ারাদু আনহু, অর্থাৎ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট বলে ফরমান শুনিয়েছেন। সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান দেখানোর এই শিক্ষা মধ্যপন্থার উপর ভিত্তিশীল। এ শিক্ষা মুসলমানদেরকে মানুষ পূজার সেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে যার মধ্যে ইহুদি ও খৃষ্টানরা নিপতিত হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বড় বড় মনীষী হাদিস, তাফসির এবং ইতিহাস বিষয়ে যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে যেসব জায়গায় সাহাবায়ে কিরাম, রসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মর্যাদা ও পূর্ণতার যে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে তাদের দুর্বলতা, বিচ্যুতি এবং ভুল-ক্রটির ঘটনা বর্ণনা করতেও দ্বিধা করা হয় নাই। অথচ বর্তমান সময়ের সম্মান প্রদর্শনের দাবিদারদের তুলনায় তাঁরা তাঁদের বেশি মর্যাদা দিতেন এবং সম্মান প্রদর্শনের সীমারেখাও তারা এদের চেয়ে বেশি জানতেন।[১৯]

* * *

খুলাফায়ে রাশেদীন রা.

১. একই মশালের কিরণ

রসূলুল্লাহ সা.-এর পর সর্বোত্তম মানুষ ছিলেন আবু বকর রা.। অতপর উমর বিন খাত্তাব রা.। অতপর উসমান বিন আফফান রা. এবং তাঁর পরে আলী ইবনে আবু তালিব। তাঁরা সকলেই সত্যের সাথে এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আক্বীদাতুত তাহাবীয়া গ্রন্থে এ কথাই অধিকতর স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

"রসূলুল্লাহ সা.-এর পর আমরা আবু বকর রা.-কে গোটা উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করে সবার আগে তাকে খিলাফতের অধিকারী বলে প্রমাণ করি। অতপর উমর বিন খাত্তাব রা.-কে। তারপর উসমান বিন আফফান রা.-কে এবং তাঁর পর আলী বিন আবু তালিব রা.-কে। আর এঁরা হলেন খুলাফায়ে রাশেদীন এবং আইম্মায়ে মাহদীয়ীন।"[২০]

২. মানব জাতির ইতিহাসে অনুপম

রসূলুল্লাহ সা. যে সৌভাগ্যবান লোকদের প্রশিক্ষণ দান করেছিলেন, মানব জাতির ইতিহাসে তাঁরা ছিলেন অতুলনীয়। এই সৌভাগ্যবান পবিত্রাত্মার মনীষীদের একজন ছিলেন উমর ফারুক রা.।[২১]

৩. উসমান রা.-এর মর্যাদা

মক্কায় উসমান রা.-এর শাহাদাতের খবর শুনে রসূলুল্লাহ সা. হুদাইবিয়া নামক স্থানে সাহাবায়ে কিরামের বায়াত গ্রহণ করেন। সাহাবায়ে কিরাম রসূলুল্লাহ সা.-এর হাতে এ কথার উপর বায়াত গ্রহণ করেন যে, উসমান রা. যদি সত্যি শহীদ হয়ে গিয়ে থাকেন তবে তাঁরা এখনই এবং এখানেই কুরাইশদের সাথে চূড়ান্তভাবে বুঝাপড়া করে নেবেন। এর ফলে তাদের সকলকে মৃত্যুবরণ করতে হলেও তারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না, কুণ্ঠিত হবেন না। উসমান রা. সত্যি শহীদ হয়েছেন নাকি জীবিত আছেন, সে বিষয়ে এ মুহূর্ত পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি। এ কারণে রসূলে করীম সা. তার পক্ষ থেকে একখানা হাত অপর হাতের উপর রেখে বায়াত গ্রহণ করেন। এর ফলে নিজের হাত উসমান রা.-এর হাতের বিকল্প ধরে নিয়ে তাঁকে এ বায়াতে শরীক করে তাঁকে এক বিরাট মর্যাদার অধিকারী বানিয়ে দেন। রসূলে করিম সা. তার পক্ষ থেকে বায়াত করার অর্থ অবশ্যি

এই যে, তাঁর উপর রসূলে করিম সা.-এর অকৃত্রিম আস্থা ও নির্ভরশীলতা ছিলো। তিনি তাঁর ব্যাপারে এ আস্থা রাখতেন যে, এখানে উপস্থিত থাকলে তিনি অবশ্যি এ বায়াতে শরীক হতেন।[২২]

৪. খলিফায়ে রাশেদ উসমান রা.

উসমান রা. নিজেই এ পথে সবচাইতে বড় বাধা ছিলেন। নিজের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে রসূলের শহরে মুসলমানরা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হোক এটা তিনি কিছুতেই চাচ্ছিলেন না। সকল প্রদেশ থেকে সৈন্যবাহিনী তলব করে তিনি অবরোধকারীদের উচিত শিক্ষা দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা থেকে বিরত থাকেন। যায়েদ বিন সাবিত রা. তাঁকে বলেছিলেন আপনার সমর্থনে সকল আনসার লড়তে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি জবাব দেন أَمَّا الْقِتَالُ فَلَا না, লড়াই করা যাবেনা। তিনি আবু হুরাইরা রা. এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-কে বলেন, আমি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নই। তাঁর পক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধ করার জন্যে সাতশত ব্যক্তি তার মহলেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাদেরকেও যুদ্ধ থেকে বিরত রাখেন।

প্রকৃতপক্ষে উসমান রা. অত্যন্ত নাজুক এ পরিস্থিতিতে সেই কর্মপন্থাই অবলম্বন করেছিলেন, যা একজন খলিফা এবং একজন বাদশার মধ্যকার পার্থক্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে দেয়। এ পরিস্থিতিতে তাঁর পরিবর্তে কোনো বাদশা হলে স্বীয় গদি রক্ষার জন্যে সে যে কোনো পন্থা অবলম্বনেই কুণ্ঠিত হতোনা। তার হাতে মদিনা শহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হলে, আনসার ও মুহাজিরদের পাইকারী ভাবে হত্যা করা হলে, রসূলের পবিত্র স্ত্রীগণকে অপমান করা হলে এবং মসজিদে নববী ভেংগে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয় তাহলেও সে তার পরোয়া করতোনা। কিন্তু উসমান রা. ছিলেন খলিফায়ে রাশেদ। একান্ত কঠিন মুহূর্তেও তিনি একথার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন যে, একজন খোদাভীরু শাসনকর্তা স্বীয় কর্তৃত্ব রক্ষার জন্যে কতোটা অগ্রসর হতে পারে আর কোথায় গিয়ে তাকে থেমে যেতে হবে? মুসলমানদের সম্মান মর্যাদা ও ইযযত আবরু পদদলিত করার চেয়ে তিনি নিজের জীবন দেয়া অতি ক্ষুদ্র কাজ বিবেচনা করেছেন। কারণ মুসলমানদের মর্যাদা ও ইযযত তো একজন মুসলমানের নিকট দুনিয়ার সবকিছু থেকে অধিকতর প্রিয় হওয়া উচিত।[২৩]

৫. আইনের অনুগত শাসক

ইসলাম যে বুনিয়াদের উপর রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে, তা হলো শরীয়ত (আইন) সবকিছুর উর্ধ্বে। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র প্রধান, শাসক এবং শাসিত, বড় এবং ছোট, সাধারণ এবং অসাধারণ সকলেই শরীয়তের অধীন। কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। আইন থেকে দূরে সরে গিয়ে কাজ করার অধিকার কারো নেই। শত্রু হোক কি মিত্র, যুদ্ধে লিপ্ত কাফির হোক কি চুক্তিবদ্ধ কাফির, মুসলিম প্রজা হোক কি অমুসলিম প্রজা, রাষ্ট্রের অনুগত মুসলিম হোক কিংবা যুদ্ধে লিপ্ত বিদ্রোহী, এক কথায় যে-ই হোক না কেন, তার সাথে আচরণের একটা রীতি শরীয়তে নির্ধারিত রয়েছে। সে রীতি কিছুতেই লংঘন করা যায়না।

খুলাফায়ে রাশেদীন তাঁদের গোটা শাসনামলে এ নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ ক'রে চলেন। এমন কি, উসমান রা. এবং আলী রা. অত্যন্ত নাযুক এব: উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতেও শরিয়তের সীমা লংঘন করেননি। এসব সত্যাশ্রয়ী খলিফাদের শাসনের বৈশিষ্ট্যই ছিলো এই যে, তা শরীয়ত নির্ধারিত সীমা মেনে চলতো। তা কখনো বল্গাহীন যথেচ্ছাচারী ছিলনা।[২৪]

৬. খুলাফায়ে রাশেদীনের দৃষ্টিতে ইসলামি রাষ্ট্রের স্বরূপ

রাষ্ট্র সম্পর্কে খুলাফায়ে রাশেদীনের কী ধারণা ছিলো, রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে নিজেদের মর্যাদা ও কর্তব্য সম্পর্কে তাঁরা কি ধারণা পোষণ করতেন আর স্বীয় রাষ্ট্রেই বা তাঁরা কোন্ নীতিমালা মেনে চলতেন? খেলাফতের মঞ্চ থেকে ভাষণ দান প্রসংগে এসব জিনিস তাঁরা নিজেরাই প্রকাশ্যে ব্যক্ত করে গেছেন।

গণ বায়াত গ্রহণের সময় আবু বকর রা. মসজিদে নববীতে প্রথম যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি বলেন :

"আমাকে আপনাদের শাসক নিযুক্ত করা হয়েছে, অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। সেই সত্তার কসম, যার মুষ্টিতে আমার জীবন- আমি নিজে ইচ্ছা করে এ পদ গ্রহণ করিনি। এ জন্যে আমি কখনো আল্লাহর নিকট দোয়াও করিনি। এজন্যে কখনো আমার অন্তরে কোনো প্রকার লোভ ও আকাংখা সৃষ্টি হয়নি। মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ এবং আরবদের মধ্যে ধর্ম ত্যাগের ফেতনার সূচনা হতে পারে এ আশংকায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। এ পদে আমার কোনো

শান্তি নেই, বরঞ্চ এ এক বিরাট বোঝা যা আমার উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। এ বোঝা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই। অবশ্য আল্লাহ যদি আমায় সাহায্য করেন। আমার ইচ্ছা ছিলো অন্য কেউ এ গুরু দায়িত্বের ভার বহন করুক। এখনো আপনারা ইচ্ছা করলে রসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীগণের মধ্যে থেকে কাউকেও এ কাজের জন্যে বাছাই করে নিতে পারেন। আমার বায়াত এ ব্যাপারে আপনাদের প্রতিবন্ধক হবেনা। আপনারা যদি আমাকে রসূলুল্লাহ্র মানদন্ডে যাচাই করে তাঁর নিকট যা আশা পোষণ করতেন, আমার নিকটেও সে আশা পোষণ করেন, তবে তাঁর ক্ষমতা আমার নেই। কারণ, তিনি শয়তান থেকে নিরাপদ ছিলেন। তাঁর উপর অহি নাযিল হতো। আমি সঠিক কাজ করলে আমার সহযোগিতা করবেন। অন্যায় করলে আমাকে সোজা করে দেবেন। সততা হচ্ছে একটি আমানত। আর মিথ্যা হচ্ছে খিয়ানত। তোমাদের দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট সবল, যতোক্ষণ না আল্লাহর ইচ্ছায় আমি তার অধিকার আদায় করে দিতে পারি। আর তোমাদের সবল ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল, যতোক্ষণ না আমি তার কাছ থেকে অধিকার আদায় করে আনতে পারি। কোনো জাতি আল্লাহর পথে চেষ্টা সংগ্রাম পরিত্যাগ করার পর আল্লাহ তার উপর অপমান লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেননি এমনটি কখনো হয়নি। কোনো জাতির মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার করার পর আল্লাহ তাদেরকে সাধারণ বিপদে নিপতিত করেননি এমনও কখনো হয়নি। আমি যতোক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত থাকি, ততোক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আমি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য পরিহার করলে তোমাদের আনুগত্য দাবি করার কোনো অধিকার আমার নেই। আমি তো কেবল অনুসরণকারী, কোনো নতুন পথের উদ্ভাবক নই।”

উমর রা. তাঁর এক ভাষণে বলেন : “হে জনগণ! আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য করতে হবে, নিজের সম্পর্কে এমন অধিকারের দাবি কেউ করতে পারেনা....। হে জনগণ! আমার উপর তোমাদের যে অধিকার রয়েছে, আমি তোমাদের তা বলে দিচ্ছি। এসব অধিকারের জন্যে তোমরা আমাকে পাকড়াও করতে পারো। আমার উপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে, আমি ‘খেরাজ’ বা আল্লাহর দেয়া ‘ফাই’ থেকে বেআইনীভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করবোনা। আর এভাবে যে অর্থ আমার হাতে আসে তার একটি অংশও আমি অন্যায়ভাবে ব্যয় করবোনা।”

বায়আত গ্রহণের পর উসমান প্রথম যে ভাষণ প্রদান করেন তাতে তিনি বলেন : "শুনো, আমি অনুসরণকারী মাত্র, নতুন পথের উদ্ভাবক নই। জেনে রাখো : আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাহ মেনে চলার পর আমি তোমাদের নিকট তিনটি বিষয় মেনে চলার অংগীকার করছি। এক : আমার খিলাফতের পূর্বে তোমরা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে নীতি নির্ধারণ করেছো, আমি তা মেনে চলবো। দুই : যেসব ব্যাপারে পূর্বে কোনো নীতি পন্থা নির্ধারিত হয়নি, সেসব ব্যাপারে সকলের পরামর্শক্রমে উত্তম পন্থা নির্ধারণ করবো। তিন : আইনের দৃষ্টিতে তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে না পড়া পর্যন্ত তোমাদের উপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবো।"

আলী রা. কায়েস ইবনে সা'আদ রা.-কে মিশরের গভর্ণর নিযুক্ত করে মিশরবাসীদের নামে যে ফরমান পাঠান, তাতে তিনি বলেন:

"সাবধান! আমি আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাহ মোতাবেক আমল করবো এ অধিকার আমার উপর তোমাদের রয়েছে। আল্লাহর নির্ধারিত অধিকার অনুযায়ী আমি তোমাদের কাজ কারবার পরিচালনা করবো এবং রসূলুল্লাহর সুন্নাহ কার্যকরী করবো। তোমাদের অগোচরেও তোমাদের কল্যাণ কামনা করবো।" প্রকাশ্য জনসমাবেশে এ ফরমান পাঠ করে শোনাবার পর কায়েস ইবনে সাআদ রা. ঘোষণা করেন : "আমি তোমাদের সাথে এভাবে আচরণ না করলে তোমাদের উপর আমার কোনো বাইয়াত নেই।

আলী রা. জনৈক গভর্ণরকে লিখেন :

"তোমরা এবং জনসাধারণের মধ্যে দীর্ঘ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করোনা। শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং জ্ঞানের স্বল্পতার পরিচায়ক। এর ফলে তারা সত্যিকার অবস্থা জানতে পারেনা। ক্ষুদ্র বিষয় তাদের জন্যে বৃহত হয়ে দাঁড়ায়, আর বিরাট বিষয় ক্ষুদ্র। তাদের জন্যে ভালো; মন্দ হয়ে দেখা দেয়। আর মন্দ গ্রহণ করে ভালোর আকার; সত্য-মিথ্যা সংমিশ্রিত হয়ে যায়।"

"আলী রা. কেবল এই কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি অনুরূপ কাজও করেছেন। তিনি নিজে দোররা নিয়ে কুফার বাজারে বেরুতেন, জনগণকে অন্যায় থেকে বারণ করতেন, ন্যায়ের নির্দেশ দিতেন। প্রত্যেকটি বাজারে চক্কর দিয়ে দেখতেন, ব্যবসায়ীরা কাজ-কারবারে প্রতারণা করছে কিনা!

এ দৈনন্দিন ঘোরাঘুরির ফলে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি তাঁকে দেখে ধারণাই করতে পারতোনা যে, মুসলিম জাহানের খলিফা তার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কারণ, তাঁর পোশাক থেকে বাদশাহীর কোনো পরিচয় পাওয়া যেতোনা, তাঁর আগে আগে পথ করে দেয়ার জন্যে কোনো রক্ষীবাহিনীও দৌড়ে যেতোনা।

একবার আমিরুল মুমিনীন উমর রা. প্রকাশ্য ঘোষণা করেন :

"তোমাদের পিটাবার জন্যে আর তোমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে আমি গভর্ণরদেরকে নিযুক্ত করিনি। তাদেরকে নিযুক্ত করেছি এ জন্যে যে, তারা তোমাদেরকে দীন এবং নবীর তরিকা পদ্ধতি শিক্ষা দেবে। কারো সাথে এই নির্দেশ বিরোধী ব্যবহার করা হলে সে আমার কাছে অভিযোগ উত্থাপন করুক। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তার (গভর্ণর) কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।" এতে আমর ইবনুল আস (মিসরের গভর্ণর) দাঁড়িয়ে বললেন : "কেউ যদি মুসলমানদের শাসক হয়ে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্যে তাদেরকে মারে, আপনি কি তার কাছ থেকেও প্রতিশোধ নেবেন?"

উমর রা. জবাব দেন : "হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তার কাছ থেকেও প্রতিশোধ নেবো। আমি আল্লাহর রসূল সা.-কে তাঁর নিজের সত্তা থেকেও প্রতিবিধান দিতে দেখেছি।"

আর একবার হজ্জ উপলক্ষে উমর রা. সমস্ত গভর্ণরকে ডেকে প্রকাশ্য সমাবেশে দাঁড়িয়ে বলেন : এদের বিরুদ্ধে কারোর উপর কোনো অত্যাচারের অভিযোগ থাকলে তা পেশ করতে পারো নির্দ্বিধায়। গোটা সমাবেশ থেকে মাত্র একজন লোক উঠে আমর ইবনুল আস-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বললেন : তিনি অন্যায়ভাবে আমাকে একশো দোররা মেরেছেন। উমর রা. বলেন : উঠো এবং তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও। আমর ইবনুল আস প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, আপনি গভর্ণরদের বিরুদ্ধে এ পথ উন্মুক্ত করবেন না। কিন্তু তিনি বলেন : "আমি আল্লাহর রসূলকে নিজের থেকে প্রতিশোধ নিতে দেখেছি। হে অভিযোগকারী এসে তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো।" শেষ পর্যন্ত আমল ইবনুল আস রা.-কে প্রতিটি বেত্রাঘাতের জন্যে দু'আশরাফী দিয়ে আপন পিঠ রক্ষা করতে হয়।[২৫]

* * *

খিলাফতে রাশেদা

১. কেবল খিলাফতে রাশেদাই নয়, খিলাফতে মুরশিদাও বটে [১]

বস্তুত, খিলাফতে রাশেদা কেবলমাত্র একটা রাজনৈতিক সরকার ব্যবস্থাই ছিলনা, বরঞ্চ তা ছিলো নবুয়্যতের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বশীল একটা ব্যবস্থা। তার কাজ কেবল এতোটুকুই ছিলনা যে, সে কেবল রাষ্ট্রের শাসন শৃঙ্খলা বজায় রাখবে, শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে এবং সীমান্ত রক্ষা করবে; বরঞ্চ তা মুসলমানদের সামাজিক জীবনের শিক্ষকতা, তত্ত্বাবধান এবং সঠিক পথ প্রদর্শনের এমন সব দায়িত্ব পালন করেছে, যা রসূলুল্লাহ্ সা. তাঁর জীবনে পালন করে গেছেন। ইসলামি রাষ্ট্রে আল্লাহ্র দীনের পূর্ণাংগ ব্যবস্থাকে তার প্রকৃত রূপ ও প্রাণসত্ত্বাসহ পরিচালনা করা এবং পৃথিবীতে মুসলমানদের সামগ্রিক শক্তিনিচয়ও আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করার কাজে নিয়োজিত করা ছিলো তার দায়িত্ব। তাই তাকে কেবল 'খিলাফত রাশেদা' না বলে 'খিলাফত মুরশিদা' বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়্যত' নবীর পদাংক অনুসারী খিলাফত' কথাটি দ্বারা এ উভয় বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠে। ইসলাম এধরণের রাষ্ট্র ব্যবস্থাই চায়, কেবল রাজনৈতিক শাসন কর্তৃত্ব নয়। এ কথাটি দীন ইসলামের সামান্য জ্ঞান রাখে এমন ব্যক্তিরও অজানা থাকার কথা নয়।[২৬]

২. খিলাফতে রাশেদার কার্যপ্রণালি ইসলামের শাসনতান্ত্রিক আইনের একটি উৎস

ইসলামি শাসনতান্ত্রিক আইনের তৃতীয় উৎস হচ্ছে খিলাফতে রাশেদার কর্মনীতি ও কার্যপ্রণালী। রসূলুল্লাহ্ সা.-এর খুলাফায়ে রাশেদীন যে পন্থা পদ্ধতিতে ইসলামি স্টেট পরিচালনা করেছেন, তার দৃষ্টান্ত এবং ধারা বিবরণী দ্বারা হাদিস, ইতিহাস এবং সীরাত গ্রন্থসমূহ পরিপূর্ণ হয়ে আছে। এসব জিনিসই আমাদের জন্যে অনুসরণীয় আদর্শ বা নমুনা। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামে এ মূলনীতি সর্বস্বীকৃত যে, সাহাবায়ে কিরাম সর্বসম্মতভাবে দীনি বিধান ও হিদায়াত সমূহের যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে গেছেন (যাকে ইসলামের পরিভাষায় ইজমা বলা হয়) এবং খুলাফায়ে রাশেদীন সাহাবায়ে কিরামের সংগে পরামর্শক্রমে শাসনতান্ত্রিক আইন

---

১. রাশেদা মানে- সঠিক পথে পরিচালিত আর 'মুরশিদা' মানে সঠিক পথের পরিচালক।

সম্পর্কিত যেসব ফায়সালা করে গেছেন, সেগুলো আমাদের জন্যে প্রমাণিত আইন (হুজজত)। অর্থাৎ সেগুলো হুবহু আমাদেরকে মেনে চলতে হবে। কেননা সাহাবায়ে কিরামের কোনো বিষয়ে ঐক্যমতে উপনীত হবার অর্থ হলো- তা আইনের বিশ্বস্ত বিশ্লেষণ এবং নির্ভরযোগ্য কর্মপন্থা। তাঁদের মধ্যে যেখানে মতবিরোধ হয়েছে, সেখানে তো একথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সে বিষয়ে দুই বা ততোধিক বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে। এ ধরণের বিষয়ে দলিল প্রমাণের মাধ্যমে একটি মতকে আরেকটির উপর অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। কিন্তু যেসব বিষয়ে তাঁদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেসব বিষয়ে তাঁদের এ ঐক্যমত কেবল একটি মাত্র বিশ্লেষণ ও কর্মপন্থাকেই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণ করে। কেননা তাঁরা সরাসরি রসূলুল্লাহ সা.-এর ছাত্র ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন। আর তাঁদের সকলেই ঐক্যমতের ভিত্তিতে কোনো দীনি বিষয়ে ভুল করা বা দীনের সঠিক বুঝ জ্ঞান থেকে দূরে অবস্থান করা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।[২৭]

৩. খুলাফায়ে রাশেদীন কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন?

খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত বলতে বুঝায় তাঁদের সেসব ফায়সালা, যা তাঁরা খলিফা হিসেবে সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শক্রমে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের এরূপ সামষ্টিক সিদ্ধান্ত কিছুতেই রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাতের বিপরীত হতে পারেনা। কেননা সাহাবায়ে কিরাম, বিশেষ করে চার খলিফা সর্বাবস্থায় এ পন্থা অনুসরণ করতেন যে, তাঁদের সামনে যখনই কোনো প্রসংগ উপস্থিত হতো তখনই তাঁরা সর্বপ্রথম সে বিষয়ে আল্লাহর কিতাব এবং সুন্নাতে রসূলের নির্দেশিকা জানার চেষ্টা করতেন। কিতাব ও সুন্নায় তার কোনো প্রমাণ পেয়ে গেলে সে অনুসারেই ফায়সালা করতেন। আর পাওয়া না গেলে সাহাবায়ে কিরামের সামষ্টিক (ইজমা) বা অধিকাংশের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো।[২৮]

৪. একটি স্বাধীন জাতি গঠনে খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ

খিলাফত সম্পর্কে খুলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মত ধারণা এই ছিলো যে, এটা একটা নির্বাচনী পদ। খলিফা এ পদে অধিষ্ঠিত হবেন মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ এবং স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে।

তাঁদের মতে বংশগত সূত্রে কিংবা বল প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখলকারী শাসন খিলাফত নয়, বাদশাহী। রসূলুল্লাহ সা.-এর পরে খুলাফায়ে

রাশেদীনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। রসূলুল্লাহ সা. এর প্রত্যক্ষ শিক্ষা-দীক্ষা ও কার্যকর নেতৃত্বের ভিত্তিতে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার প্রত্যেক সদস্যই জানতো, ইসলামের বিধি বিধান ও প্রাণ সত্তা অনুযায়ী কোন্ ধরণের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত। নিজের স্থলাভিষিক্তের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সা. কোনো ফায়সালা না দিয়ে গেলেও ইসলাম একটি শূরাভিত্তিক খেলাফত দাবি করে, মুসলিম সমাজের সদস্যরা একথা অবগত ছিলো। তাই সেখানে কোনো বংশানুক্রমিক বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বল প্রয়োগে কোনো ব্যক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি, খেলাফত লাভ করার জন্যে কেউ নিজের তরফ থেকে চেষ্টা-তদবির করেনি বা নামমাত্র প্রচেষ্টাও চালায়নি। বরং জনগণ তাদের স্বাধীন মর্জি মতো পর পর চারজন সাহাবীকে তাদের খলিফা নির্বাচিত করে। মুসলিম মিল্লাত এ খেলাফতকে খেলাফতে রাশেদা বা সত্যাশ্রয়ী খেলাফত বলে গ্রহণ করেছে। এ থেকে আপনা আপনিই প্রকাশ পায় যে, মুসলমানদের দৃষ্টিতে এটিই ছিলো খেলাফতের সত্যিকার পদ্ধতি।

রসূলুল্লাহ সা.-এর স্থালাভিষিক্তের জন্যে উমর রা. আবু বকর রা.-এর নাম প্রস্তাব করেন। মদিনার সকলেই (বস্তুত তখন তারা কার্যত সারা দেশের প্রতিনিধির মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলো) কোনো প্রকার চাপ-প্রভাব এবং প্রলোভন ব্যতীত নিজেরা সন্তুষ্ট চিত্তে তাকে পছন্দ করে তাঁর হাতে বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) করে।

আবু বকর রা. তাঁর ওফাতকালে উমর রা.-এর সম্পর্কে ওসিয়ত লিখান, অতপর জনগণকে মসজিদে নববীতে সমবেত করে বলেন:

"আমি যাকে স্থলাভিষিক্ত করছি তোমরা কি তার উপর সন্তুষ্ট? আল্লাহর শপথ! সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগে আমি বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিনি। আমার কোনো আত্মীয়-স্বজনকে নয়, বরং উমর ইবনুল খাত্তাবকে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি। সুতরাং তোমরা তাঁর নির্দেশ শুনবে এবং আনুগত্য করবে।" সবাই সমস্বরে বলে উঠে : আমরা তাঁর নির্দেশ শুনবো এবং মানবো।

উমর রা.-এর জীবনের শেষ বছর হজ্জের সময় এক ব্যক্তি বললো : উমর রা. মারা গেলে আমি অমুক ব্যক্তির হাতে বাইয়াত করবো। কারণ, আবু বকর রা.-এর বাইয়াতও তো হঠাতই হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হয়েছেন। উমর রা. এ সম্পর্কে জানতে পেরে বললেন : এ ব্যাপারে আমি

এক ভাষণ দেবো। জনগণের উপর যারা জোর পূর্বক নিজেদেরকে চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করছে, তাদের সম্পর্কে আমি জনগণকে সতর্ক করে দেবো। মদিনায় পৌঁছে তাঁর প্রথম ভাষণেই তিনি এ ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। সাকীফায়ে বনী সায়েদার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে বলেন যে, তখন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে হঠাৎ আবু বকর রা.-এর নাম প্রস্তাব করে আমি তাঁর হাতে বাইয়াত করেছিলাম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন : তখন যদি এ রকম না করতাম এবং খেলাফতের মীমাংসা না করেই আমরা মসলিস ছেড়ে উঠে আসতাম, তবে রাতারাতি লোকদের কোনো ভুল সিদ্ধান্ত করে বসার আশংকা ছিলো। আর সে ফায়সালা মেনে নেয়া এবং তা পরিবর্তন করা উভয়ই আমাদের জন্যে কঠিন হতো। এ পদক্ষেপটি সাফল্যমণ্ডিত হলেও ভবিষ্যতের জন্যে একে নযীর হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারেনা। আবু বকর রা.-এর উন্নত মানের এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব তোমাদের মধ্যে আর কে আছে? এখন কোনো ব্যক্তি যদি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কারো হাতে বাইয়াত করে তাহলে সে এবং যার হাতে বাইয়াত করা হবে-উভয়েই নিজেকে মৃত্যুর হাতে সোপর্দ করবে।

তাঁর নিজের ব্যাখ্যা করা এ পদ্ধতি অনুযায়ী উমর রা. খেলাফতের ফায়সালা করার জন্যে তাঁর ওফাতকালে একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করে বলেন : 'মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত যে ব্যক্তি জোর করে আমীর হওয়ার চেষ্টা করবে, তাকে হত্যা করো। খেলাফত যাতে বংশানুক্রমিক পদাধিকারে পরিণত না হয়, সে জন্যে তিনি খেলাফত লাভের যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে নিজের ছেলের নাম সুস্পষ্টভাবে বাদ দিয়ে দেন। ছ'ব্যক্তিকে নিয়ে এ নির্বাচনী কমিটি গঠিত হয়। উমর রা.-এর মতে এরা ছিলেন কওমের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং জনপ্রিয়।

কমিটির সদস্য আবদুর রহমান ইবনে আওফকে কমিটি শেষ পর্যন্ত খলিফার নাম প্রস্তাব করার ইখতিয়ার দেন। সাধারণ লোকদের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করে তিনি জানতে চেষ্টা করেন, কে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। হজ্জ শেষ করে যেসব কাফেলা বিভিন্ন এলাকায় ফিরে যাচ্ছিলো, তিনি তাদের সাথেও আলোচনা করেন। এ জনমত যাচাইয়ের ফলে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অধিকাংশ লোকই উসমান রা.-এর পক্ষে। তাই তাঁকেই খেলাফতের জন্যে নির্বাচিত করা হয়। সাধারণ জনসমাবেশে তার বায়আত হয়।

উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর কিছু লোক আলী রা.-কে খলিফা করতে চাইলে তিনি বলেন : "এমন করার ইখতিয়ার তোমাদের নেই। এটা তো শূরার সদস্য এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কাজ। তারা যাকে খলিফা করতে চান, তিনিই খলিফা হবেন। আমরা মিলিত হবো এবং এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করবো। তাবারি আলী রা.-এর যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তা হচ্ছে : "গোপনে আমার বাইয়াত অনুষ্ঠিত হতে পারেনা, তা হতে হবে মুসলমানদের মর্জি অনুযায়ী।

আলী রা.-এর ওফাতকালে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আমরা আপনার পুত্র হাসান রা.-এর হাতে বাইয়াত করবো? জবাবে তিনি বলেন : "আমি তোমাদেরকে নির্দেশও দিচ্ছি না, নিষেধও করছিনা। তোমরা নিজেরাই এ ব্যাপারে ভালোভাবে বিবেচনা করতে পারো।" তিনি যখন আপন পুত্রদেরকে শেষ ওসিয়ত করছিলেন, ঠিক সে সময় জনৈক ব্যক্তি আরয করলো, আমীরুল মুমিনীন! আপনি আপনার উত্তরসুরী মনোনয়ন করছেন না কেন? জবাবে তিনি বলেন : "আমি মুসলমানদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে যেতে চাই, যে অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"

এসব ঘটনা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, খেলাফত সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং রসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীগণের সর্বসম্মত মত এই ছিলো যে, খেলাফত একটা নির্বাচন ভিত্তিক পদমর্যাদা। মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ এবং তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমেই তা কায়েম করতে হবে। বংশানুক্রমিক বা বল প্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তাঁদের মতে খেলাফত নয়, বরং তা বাদশাহী-রাজতন্ত্র। খেলাফত এবং রাজতন্ত্রের যে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা সাহাবায়ে কিরামগণ পোষণ করতেন, আবু মুসা আশআরী রা. তা ব্যক্ত করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায় : এমারত (অর্থাৎ খেলাফত) হচ্ছে তাই, যা প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ নেয়া হয়েছে, আর তরবারির জোরে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হচ্ছে বাদশাহী বা রাজতন্ত্র।[২৯]

৫. খিলাফতে রাশেদার শূরা ভিত্তিক সরকার

এই চারজন খলিফাই সরকার পরিচালনা এবং আইন প্রণয়নের ব্যাপারে জাতির বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ না করে কোনো কাজ করতেন না। সুনানে দারেমীতে মাইমুন ইবনে মাহরানের একটি

বর্ণনা আছে। তিনি বলেন : আবু বকর রা.-এর নীতি ছিলো, তাঁর সামনে কোনো বিষয় উত্থাপিত হলে তিনি দেখতেন এ বিষয়ে আল্লাহর কিতাব কী বলে? সেখানে কোনো নির্দেশ না পেলে এ ধরণের বিষয়ে রসূলুল্লাহ সা. কি ফায়সালা দিয়েছেন তা জানতে চেষ্টা করতেন। রসূলের সুন্নায়ও কোনো নির্দেশ না পেলে জাতির শীর্ষস্থানীয় এবং সৎ ব্যক্তিদের সমবেত করে পরামর্শ করতেন। সকলের পরামর্শক্রমে যে মত-ই স্থির হতো, সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। উমর রা.-এর কর্মনীতিও ছিলো অনুরূপ।

পরামর্শের ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদীনের দৃষ্টিভংগি ছিলো, শূরার সদস্যদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উমর রা. এক পরামর্শ সভার উদ্বোধনী ভাষণে খিলাফতের পলিসি এভাবে বর্ণনা করেন : আমি আপনাদেরকে যে জন্যে কষ্ট দিয়েছি, তা এছাড়া আর কিছুই নয়, আপনাদের কার্যক্রমের আমানতের যে বোঝা আমার উপর ন্যাস্ত হয়েছে তা বহন করার কাজে আপনারাও আমার সংগে শরীক হবেন। আমি আপনাদেরই একজন। আর আজ আপনারাই হলেন সেসব লোক যারা হকের স্বীকৃতি দানকারী। আপনাদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। আবার যাদের ইচ্ছা আমার সাথে একমতও হতে পারেন। আপনারা কেবল আমার মতামত মেনে নেবেন- এমনটি আমি চাইনা।[৩০]

৬. আইনের অধীনতা

খুলাফায়ে রাশেদীন নিজেদেরকেও আইনের উর্ধ্বে রাখতেননা। তাঁরা নিজেদেরকে এবং দেশের একজন সাধারণ নাগরিককে (মুসলমান হোক কিংবা অমুসলমান) আইনের দৃষ্টিতে সমান বলে ঘোষণা করেন। রাষ্ট্র প্রধান হবার কারণে যদিও তাঁরাই বিচারকগণকে নিয়োগ করতেন, কিন্তু কোনো ব্যক্তি বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হবার পর স্বয়ং খলিফার বিরুদ্ধে রায় দেবার ব্যাপারে ঠিক সেরকম স্বাধীন ছিলেন, যেমনটি স্বাধীন ছিলেন সাধারণ নাগরিকদের ব্যাপারে। একবার উমর রা. এবং উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর মধ্যে এক ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়। উভয়ে যায়েদ ইবনে সাবেত রা. কে সালিশ নিযুক্ত করেন, বাদী-বিবাদী উভয়ে যায়েদ রা.-এর নিকট উপস্থিত হলেন। যায়েদ রা. দাঁড়িয়ে উমর রা. কে তাঁর আসনে বসাতে চাইলেন; কিন্তু তিনি উবাই রা.-এর সাথে বসলেন। অতপর উবাই ইবনে কা'ব রা. আর্যি পেশ করলেন , উমর রা. অভিযোগ অস্বীকার করলেন। নিয়ম অনুযায়ী যায়েদ রা.-এর উচিত ছিলো উমর রা.-এর কাছ

থেকে কসম আদায় করা, কিন্তু তিনি তা করতে ইতস্তত করলেন, উমর রা. নিজে কসম খেয়ে মজলিস সমাপ্তির পর বললেন : "যতোক্ষণ যায়েদের কাছে একজন সাধারণ মুসলমান এবং উমর সমান না হয়, ততোক্ষণ যায়েদ বিচারক হতে পারেনা।"

এমনি একটি ঘটনা ঘটে জনৈক খৃষ্টানের সাথে আলী রা.-এর। কুফার বাজারে আলী রা. দেখতে পেলেন, জনৈক খৃষ্টান তাঁর হারানো লৌহবর্ম বিক্রি করছে। আমীরুল মুমিনীন হিসেবে তিনি সে ব্যক্তির নিকট থেকে বর্ম ছিনিয়ে নেননি বরং কাযীর দরবারে ফরিয়াদ করলেন। তিনি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে না পারায় কাযী তার বিরুদ্ধে রায় দান করলেন।

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লেকান বর্ণনা করেন যে, একবার আলী রা. এবং জনৈক যিম্মি বাদী-বিবাদী হিসেবে কাযী শোরাইহ-এর আদালতে উপস্থিত হন। কাযী দাঁড়িয়ে আলী রা. অভ্যর্থনা জানান। এতে তিনি (আলী রা.) বলেন, 'এটা তোমার প্রথম বে-ইনসাফি।'[৩১]

৭. স্রষ্টা এবং সৃষ্টির অধিকারের সংরক্ষক

তাঁরা বায়তুল মালকে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির আমানত মনে করতেন। তাতে বে-আইনী কিছুর আমদানী কিংবা বে আইনী খরচের কোনো সুযোগ তারা রাখতেন না। শাসকদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এর ব্যবহার তাদের নিকট সম্পূর্ণ হারাম ছিলো। বাদশাহী এবং খিলাফতের মৌলিক পার্থক্যই তাদের দৃষ্টিতে এই ছিলো যে, বাদশাহী জাতীয় অর্থ ভান্ডারকে ব্যক্তিগত কোষাগারে পরিণত করে তা থেকে কামনা বাসনা অনুযায়ী যথেচ্ছা খরচ করে থাকে। আর খলিফা সেটাকে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির আমানত মনে করে প্রতিটি পয়সা হক পথে আদায় করেন এবং হক পথে ব্যয় করেন।

উমর রা. একদা সালমান ফারসী রা. কে জিজ্ঞেস করেন : "আমি বাদশাহ না খলিফা?" তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দেন : মুসলমানদের ভুমি থেকে আপনি যদি এক দেরহামও অন্যায়ভাবে উসুল এবং অন্যায়ভাবে ব্যয় করেন তাহলে আপনি খলিফা নন, বাদশা।" অপর এক প্রসঙ্গে একদা উমর রা. স্বীয় মজলিসে বলেন : "আল্লাহর কসম, আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছিনা যে, আমি বাদশা, না খলিফা। আমি যদি বাদশাহ হয়ে থাকি তবে তা তো এক সাংঘাতিক কথা!" এতে জনৈক ব্যক্তি বললো : আমীরুল মুমিনীন! এতদোভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।" উমর রা. জিজ্ঞেস করলেন, কি পার্থক্য? তিনি বললেন : "খলিফা অন্যায়ভাবে কিছু

গ্রহণ করেন না, অন্যায়ভাবে কিছু ব্যয়ও করেন না। আল্লাহর মেহেরবানীতে আপনিও অনুরূপ। আর বাদশাহ তো মানুষের উপর যুলুম করে, অন্যায়ভাবে একজনের কাছ থেকে উসুল করে, আর অন্যায়ভাবেই অপরজনকে দান করে।"

এ ব্যাপারে খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মধারা প্রণিধানযোগ্য। আমীরুল মুমিনীন আবু বকর রা. খলিফা হওয়ার পরদিন কাপড়ের থান কাঁধে নিয়ে বিক্রি করার জন্যে বেরিয়েছেন। কারণ, খেলাফতের পূর্বে এটাই ছিলো তাঁর জীবিকার অবলম্বন। পথে উমর রা.-এর সাথে দেখা। তিনি বললেন, আপনি একি করছেন? জবাব দিলেন, ছেলে-মেয়েদের খাওয়াবো কোত্থেকে? উমর রা. বললেন, মুসলমানদের নেতৃত্বের ভার আপনার উপর অর্পিত হয়েছে। ব্যবসায়ের সাথে খেলাফতের কাজ চলতে পারেনা। চলুন আবু উবায়দা (বায়তুল মালের খাজাঞ্চী)-এর সাথে আলাপ করি। তাই হলো। উমর রা. আবু উবায়দার সাথে আলাপ করলেন। তিনি বললেন : একজন সাধারণ মুহাজিরের আমদানীর মান সামনে রেখে আমি আপনার জন্যে ভাতা নির্ধারণ করে দিচ্ছি। এ ভাতা মুহাজিরদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তির সমানও নয়; আবার সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তির পর্যায়েও নয়। এমনিভাবে তাঁর জন্যে একটা ভাতা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এর পরিমাণ ছিলো বার্ষিক চার হাজার দিরহামের কাছাকাছি। কিন্তু তাঁর ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি অসিয়ত করে যান যে, আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আট হাজার দিরহাম বায়তুলমালকে ফেরত দেবে। উমর রা.-এর নিকট তা আনা হলে তিনি বলেন : "আল্লাহ আবু বকর রা.-এর প্রতি রহমত করুন। উত্তরসূরীদেরকে তিনি মুশকিলে ফেলেছেন।"

বায়তুল মালে খলিফার অধিকার কতোটুকু এ প্রসঙ্গে খলিফা উমর রা. একদা তাঁর ভাষণে বলেন :

"গ্রীষ্মকালে এক জোড়া কাপড়, শীতকালে একজোড়া কাপড়, কুরাইশের একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির সমপরিমাণ অর্থ আপন পরিবার-পরিজনের জন্যে এ ছাড়া আল্লাহর সম্পদের মধ্যে আর কিছুই আমার জন্যে হালাল নয়। আমি তো মুসলমানদের একজন সাধারণ ব্যক্তি বৈ কিছুই নই।"

অপর এক ভাষণে তিনি বলেন :

"এ সম্পদের ব্যাপারে তিনটি বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুকেই আমি ন্যায় মনে করিনা। ন্যায়ভাবে গ্রহণ করা হবে, ন্যায় মুতাবিক প্রদান করা হবে

এবং বাতেল থেকে তাকে মুক্ত করা হবে। এতীমের সম্পদের সাথে তার অভিভাবকের যে সম্পর্ক, তোমাদের এ সম্পদের সাথে আমার সম্পর্কও ঠিক অনুরূপ। আমি অভাবী না হলে তা থেকে কিছুই গ্রহণ করবো না, অভাবী হলে মারূফ পন্থায় গ্রহণ করবো।"

আবু বকর রা. এবং উমর রা.-এর বেতনের মান যা ছিলো, আলী রা.-ও তাঁর বেতনের মান তাই রাখলেন। তিনি পায়ের হাঁটু ও গোড়ালীর মাঝ বরাবর পর্যন্ত উঁচু তহবন্দ পরতেন। তাও আবার ছিলো তালিযুক্ত। সারাজীবন কখনো একটু আরামে কাটাবার সুযোগ হয়নি। একবার শীতের মওসুমে জনৈক ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাত করতে যান। দেখেন, তিনি একখানা ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে বসে আছেন আর শীতে কাঁপছেন। শাহাদাতের পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির হিসাব নিয়ে দেখা গেলো মাত্র ৭শত দিরহাম। তাও তিনি এক পয়সা এক পয়সা করে সঞ্চয় করেছেন একটা গোলাম খরিদ করার জন্যে। আমিরুল মুমিনীন বলে চিনতে পেরে তাঁর কাছ থেকে যাতে কম মূল্য কেউ গ্রহণ না করে- এ ভয়ে কোনো পরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে বাজারে কখনো কোনো জিনিস কিনতেন না। সে সময় মুয়াবিয়া রা.-এর সাথে তাঁর সংঘর্ষ চলছিল, কেউ কেউ তাঁকে পরামর্শ দিলো যে, মুয়াবিয়া রা. যে রকম লোকদেরকে অঢেল দান-দক্ষিণা করে তাঁর সাথি করে নিচ্ছেন আপনিও তেমনি বায়তুল মালের ভান্ডার উজার করে টাকার বন্যা বইয়ে দিয়ে সমর্থক সংগ্রহ করুন। কিন্তু তিনি এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করলেন, "তোমরা কি চাও, আমি অন্যায়ভাবে সফল হই?" তাঁর আপন ভাই আকীল রা. তাঁর কাছে টাকা দাবি করেন বায়তুলমাল থেকে। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করে বলেন : "তুমি কি চাও তোমার ভাইও মুসলমানদের টাকা তোমাকে দিয়ে জাহান্নামে যাক?"[৩২]

৮. ইসলামি গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের আদর্শ নমুনা

খিলাফতে রাশেদার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সমূহের অন্যতম ছিলো সমালোচনা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। খলিফা সর্বক্ষণ জনগণের নাগালের মধ্যে থাকতেন। তাঁরা নিজেরা শূরার অধিবেশনে বসতেন এবং আলোচনায় অংশ নিতেন। তাঁদের কোনো সরকারি দল ছিলোনা। তাঁদের বিরুদ্ধেও কোনো দলের অস্তিত্ব ছিলোনা। মুক্ত স্বাধীন পরিবেশে শূরার প্রত্যেক

সদস্য নিজ নিজ ঈমান ও বিবেক অনুযায়ী মত প্রকাশ করতেন। সকল বিষয় মজলিসে শূরার সামনে হুবহু পেশ করা হতো। কোনো কিছুই গোপন করা হতোনা কিংবা কাট ছাঁট করা হতোনা। ফায়সালা হতো দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে, কারো দাপট, প্রভাব প্রতিপত্তি, স্বার্থ সংরক্ষণ বা দলাদলির ভিত্তিতে নয়। এই খলিফাগণ কেবল মজলিসে শূরার মাধ্যমেই জাতির সম্মুখীন হতেন না, বরঞ্চ দৈনিক পাঁচবার নামাযের জামায়াতে, সপ্তাহে একবার জুমুয়ার জামায়াতে, বৎসরে দুইবার ঈদেও জামায়াতে এবং হজ্জ সম্মেলনে তাঁরা জাতির সামনে উপস্থিত হতেন। অপরদিকে জাতিও এসব সময় তাঁদের সাথে মিলিত হবার সুযোগ পেতো। জনগণের মাঝেই তাঁরা বসবাস করতেন। যে কোনো প্রয়োজনে লোকেরা তাদের সাথে সাক্ষাত করতে পারতো এবং তাদেরকে দারোয়ানের সম্মুখীন হতে হতোনা। কোনো প্রকার দেহরক্ষী বা রক্ষীবাহিনী ছাড়াই তাঁরা হাট বাজারে জনগণের মধ্যে চলাফেরা করতেন। এ সকল অবস্থায়ই যে কোনো ব্যক্তি তাদের সাথে কথা বলতে পারতো, তাদের সমালোচনা করতে পারতো এবং কৈফিয়ত তলব করতে পারতো। তাঁরা জনগণকে এরূপ স্বাধীনতার কেবল সুযোগই দিতেননা, বরঞ্চ উৎসাহিত করতেন।

- আবু বকর রা. তাঁর খিলাফতের প্রথম ভাষণে প্রকাশ্যে সর্ব সাধারণের সামনে বলে দেন, আমি সোজা পথে চললে আপনারা আমার সাহায্য করবেন, আর বাঁকা পথে চললে সোজা করে দেবেন।

- একবার উমর রা. জুমুয়ার খুতবায় মত প্রকাশ করেন, কোনো ব্যক্তিকে যেনো বিয়েতে চারশত দিরহামের অধিক মোহর ধার্যের অনুমতি দেয়া না হয়। সাথে সাথে জনৈক মহিলা এর প্রতিবাদ করে বলেন, আপনার এ নির্দেশ দেয়ার কোনো অধিকার নেই। কুরআন সম্পদের স্তুপ (কিনতার) মোহর হিসেবে দেয়ার অনুমতি দিচ্ছে। সেটাকে সীমিত করার কি অধিকার আপনার আছে? উমর রা. সাথে সাথে স্বীয় মত প্রত্যাহার করেন।

- একদিন উমর রা. মজলিসে উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করলেন : কোনো ব্যাপারে যদি আমি শৈথিল্য দেখাই তাহলে তোমরা কি করবে? সাথে সাথে বিশর বিন সাআদ রা. বলে দিলেন : এমনটি করলে আমরা আপনাকে তীরের মতো সোজা করে দেবো। উমর রা. বললেন : তবেই তো তোমরা কাজের মানুষ।

● সর্বাধিক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন উসমান রা.। কিন্তু তিনি কখনো জোর পূর্বক কারো মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। বরঞ্চ সর্বদা অভিযোগ ও সমালোচনার জবাবে প্রকাশ্যে সর্বসাধারণের সামনে নিজের বক্তব্য ও জবাব পেশ করেছেন।

● আলী রা. তাঁর খিলাফত আমলে খারেজীদের নিকৃষ্ট ধরণের কটুক্তিকেও শান্ত মনে বরদাশত করেছেন। একবার পাঁচজন খারেজীকে গ্রেফতার করে তাঁর সামনে হাযির করা হয়। এর সকলেই তাঁকে প্রকাশ্যে গালি দিচ্ছিল। এদের একজন প্রকাশ্যে আলী রা.-কে হত্যা করার শপথ করে। কিন্তু আলী রা. এদের সবাইকে ছেড়ে দেন। তিনি লোকদের বলেন : তোমরা ইচ্ছে করলে এদের গাল মন্দের জবাবে গাল মন্দ দিতে পারো। কিন্তু কার্যত কোনো বিদ্রোহী ভূমিকা গ্রহণ না করা পর্যন্ত মৌখিক বিরোধিতা এমন কোনো অপরাধ নয়, যদ্দরুন তাদেরকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

খিলাফতে রাশেদার যে শাসনামলের কথা উপরে আলোচনা করলাম, তা ছিলো একটি আলোর মিনার। পরবর্তীকালে ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং সাধারণ দীনদার মুসলমানগণ সে মিনারের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। ইসলামের ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তারা এ মিনারকেই আদর্শ মনে করে আসছেন।[৩৩]

৯. ইসলামি নীতির মূর্ত প্রতীক

আলী রা. সিফফীন যুদ্ধের ব্যাপারে যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেন, তা একজন খলিফায়ে রাশেদ এবং একজন বাদশার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। তিনি প্রথমে আপন সেনাবাহিনীর মধ্যে ঘোষণা করেছেন, কোনো পলায়নকারীর পেছনে ধাওয়া করবেনা। বিজয় শেষে তিনি উভয় পক্ষের শহীদদের জানাযার সালাত আদায় করান এবং সমান মর্যাদার সাথে তাদেরকে দাফন করান। বিরোধী বাহিনীর কাছ থেকে পাওয়া অর্থ-সম্পদকে গণীমতের মাল সাব্যস্ত করতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। বসরার জামে মসজিদে সংগৃহীত সম্পদ জড়ো করে তিনি ঘোষণা করে : যে ব্যক্তি তার নিজের মাল চিনতে পারে সে যেন তা নিয়ে যায়। লোকেরা খবর রটায় আলী রা. বসরার পুরুষদের হত্যা করতে চায়, আর চায় স্ত্রীদের দাসীতে পরিণত করতে। আলী রা. তাৎক্ষনাৎ এ অপপ্রচারের প্রতিবাদ করে বলেন : "আমার মতো লোক থেকে এ ধরণের আশংকা করা উচিত নয়, এ আচরণ তো কাফেরদের সাথে করার

মতো। মুসলমানদের সাথে এহেন আচরণ করা যায়না।" বসরায় প্রবেশ করলে স্ত্রীরা গৃহের অভ্যন্তর থেকে গালমন্দ এবং নিন্দাবাদে জর্জরিত করে। আলী রা. তাঁর সেনাবাহিনীর মধ্যে ঘোষণা করে দেন : "সাবধান! কারোর সম্ভ্রম নষ্ট করবেনা, কারো গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করবেনা, কোনো নারীকে উত্যক্ত করবেনা, -তারা তোমাদের আমীর এবং সৎ ব্যক্তিদের গালমন্দ করলেও না। এরা যখন মুশরিক ছিলো, তখনও তো এদের উপর হস্তক্ষেপ করা থেকে আমাদেরকে বারণ করা হয়েছিল। এখন তো এরা মুসলমান; তবে কি করে এখন এদের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারি? পরাজিত পক্ষের আসল পরিচালক উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রা.-এর সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করেন এবং পরিপূর্ণ মর্যাদার সাথে তাঁকে মদিনায় প্রেরণ করেন। যোবায়ের রা. এর হন্তা এনাম লাভের আশায় উপস্থিত হলে তিনি তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দান করেন, তার হাতে যোবায়ের রা.-এর তরবারি দেখে বলেন : কতোবার এ তরবারি রসূলুল্লাহ সা.-কে হেফাযত করেছিল। তালহা রা.-এর পুত্র সাক্ষাত করতে এলে অত্যন্ত আদরের সাথে তাকে নিকটে বসতে দেন, তাঁকে তাঁর সম্পত্তি ফেরত দিয়ে বলেন : আমি আশা করি, আখেরাতে তোমার পিতা এবং আমার মধ্যে যে ঘটনা ঘটবে, তাকে আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে এভাবে বর্ণনা করেছেন :

"আমি তাদের অন্তরের কলুষ-কালিমা বিদুরীত করবো, আর তারা ভাইয়ের মতো একে অন্যের সম্মুখে উচ্চাসনে উপবিষ্ট হবে।[৩৪]

* * *

সাহাবায়ে কিরামের ইখলাস ও আনুগত্য
রাদিয়াল্লাহু আনহুম

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ •

অর্থ: "আর সে তিনজনকেও তিনি মাফ করে দিয়েছেন, যাদের বিষয়টি মুলতবী রাখা হয়েছিল। যখন তাদের জন্যে যমীন তার বিশাল প্রশস্ততা সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে গেলো এবং তাদের জীবন তাদের জন্যে বোঝা হয়ে পড়লো আর তারা বুঝে নিলো যে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে বাঁচার জন্যে স্বয়ং আল্লাহর রহমতের আশ্রয় ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই, তখন আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তাদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন যেনো তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। তিনি অবশ্যি বড় ক্ষমাদানকারী দয়াময়।" (সূরা তাওবা : ১১৮)

এ তিনজন সাহাবী ছিলেন কায়াব ইবনে মালিক রা., হিলাল ইবনে উমাইয়া রা. এবং মুরারা ইবনে রুবাই রা.। (আগেই বলেছি) এরাঁ তিনজনই ছিলেন সাচ্চা মুমিন। এর আগে বহুবারই তাঁরা তাঁদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার প্রমাণ দিয়েছেন। ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করেছেন। শেষোক্ত দু'জন সাহাবী তো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর বদরের সাহাবীগণের ঈমানী নিষ্ঠা ও সততা তো সর্বপ্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে। আর প্রথমোক্ত সাহাবী যদিও বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন না, কিন্তু বদর ছাড়া বাকি সকল যুদ্ধেই রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এসব মহান খিদমত সত্ত্বেও এ নাজুক সময় তাদের গাফলতি প্রকাশ হয়ে পড়ে। যখন যুদ্ধে অংশ গ্রহণে যোগ্য সকল ঈমানদারকেই যুদ্ধে রওয়ানা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তার জন্যে তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হলো। তাবুক থেকে ফিরে এসে রসূলুল্লাহ সা. মুসলমানদের নির্দেশ প্রদান করেন, কেউ যেনো তাদের সাথে সালাম কালাম না করে। চল্লিশ দিন পর তাদের স্ত্রীগণকেও তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। বাস্তবিক পক্ষে মদিনার সেই জনবসতিতে তাদের অবস্থা ঠিক তাই হয়ে যায়, যার চিত্র এ আয়াতে তুলে ধরা

হয়েছে। অবশেষে যখন তাদেরকে বয়কোট করার মেয়াদ পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হলো, তখন তাদের ক্ষমা করে দেয়ার এ হুকুম নাযিল হয়।

এ তিনজনের মধ্যে কায়াব ইবনে মালিক তাঁর কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এ কাহিনী বাস্তবিকই চরম শিক্ষাপ্রদ। বৃদ্ধাবস্থায় যখন তিনি অন্ধ হয়ে পড়েন, তখন পুত্র আবদুল্লাহর নিকট যে তাঁকে হাতে ধরে চলাফেরা করাতো স্বয়ং এ কাহিনী বর্ণনা করেন: "তবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির প্রাক্কালে যখনই রসূলুল্লাহ সা. মুসলমানদেরকে যুদ্ধ যাত্রার আহবান জানাতেন, আমি মানসিকভাবে যুদ্ধ যাত্রার জন্যে সংকল্পবদ্ধ হতাম। ঘরে ফিরে এলে মন আড়ষ্ট হয়ে পড়তো। তখন মনে মনে বলতাম, অসুবিধা কি, যাত্রার সময় হলে প্রস্তুতি নিতে আর সময় লাগবেনা। এভাবে ব্যাপারটি বিলম্বিত হতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো সৈন্যদের যাত্রার সময় উপস্থিত আর আমি তখনো অপ্রস্তুত। মনে মনে বললাম, সেনাবাহীনী অগ্রসর হোক, আমি দুয়েকদিন পর পথে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই গাফলতি ও আড়ষ্টতা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো আর এদিকে তাঁদের সাথে মিলিত হবার সময় ফুরিয়ে গেলো। মদিনায় অবস্থানের এই দিনগুলোতে এ অবস্থা দেখে আমার মনে চরম আঘাত লাগছিল যে, আমি যাদের সাথে এখানে রয়ে গেছি তারা হয় মুনাফিক না হয় সেই দুর্বল অক্ষম লোক যাদেরকে আল্লাহ মাযুর করে রেখেছেন।

তবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করে রসূলুল্লাহ সা. তাঁর নিয়ম মাফিক প্রথমে মসজিদে এসে দু'রাকাআত নামায পড়েন। অত:পর লোকদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে বসে পড়েন। মুনাফিকরা এ মজলিসে এসে কসম খেয়ে নিজেদের দীর্ঘ লম্বা ওযরের ফিরিস্তি পেশ করতে থাকে। এদের সংখ্যা ছিলো আশিরও অধিক। নবীপাক তাদের প্রত্যেকের মনগড়া কথাবার্তা শুনেন এবং তাদের বাহ্যিক ওযরকে তিনি গ্রহণ করেন আর মূল ব্যাপার আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে বলেন: আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করুন। অত:পর আমার পালা আসলো। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আমি সালাম দিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি মুচকি হেসে বললেন "এসো, কোন্ জিনিস তোমাকে বাধা দিয়েছিল?" আমি আরয করলাম : "আল্লাহর শপথ! আমি দুনিয়ার কোনো মানুষের সামনে দন্ডায়মান থাকলে অবশ্যি কোনো না কোনো কথা বানিয়ে নিয়ে তাকে রাজি করার চেষ্টা করতাম। মনগড়া কথাতো কতোই বলা যায়। কিন্তু আপনার সম্পর্কে আমার ইয়াকীন ও দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে, এখন কোনো মনগড়া ওযর পেশ করে আপনাকে যদি সন্তুষ্ট করে নিইও,

তবু অবশ্যি আল্লাহ আমার প্রতি আপনাকে অসন্তুষ্ট করে দেবেন। হ্যাঁ, যদি সত্যি কথা বলি, তবে আপনি অসন্তুষ্ট হলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করার কোনো না কোনো ব্যবস্থা করবেন।"

"প্রকৃত ঘটনা হলো, আপনার কাছে পেশ করার মতো আমার কোনো ওযর নেই। যুদ্ধে যেতে আমি পুরোপুরি সক্ষম ছিলাম।"

একথা শুনে রসূলুল্লাহ সা. বললেন : এব্যক্তিই সত্য কথা বলেছে। আচ্ছা এখন যাও, তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কোনো ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।"

আমি উঠে আমার কবিলার মধ্যে চলে এলাম। এখানে সকলেই আমার পেছনে লেগে গেলো। আমি কেন কোনো ওযর পেশ করলাম না সেজন্যে তারা আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো। এসব কথা শুনে আমার মনেও কিছুটা ইচ্ছা জাগলো যে, গিয়ে রসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে কোনো একটা মনগড়া ওযর পেশ করি। কিন্তু আমি যখন অবগত হলাম, আরো দুজন নেক লোক (মুরার ইবনে রবাঈ এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া) ও আমারই মতো সত্য কথা বলেছেন, তখন আমি আশ্বস্ত হলাম এবং সত্যের উপর অটল হয়ে পড়ে থাকলাম।

অতপর রসূলুল্লাহ সা. সাধারণ নির্দেশ প্রদান করলেন, আমাদের তিনজনের সংগে কেউ যেনো কথা না বলে। তাঁরা দুজনে ঘরে পড়ে থাকলেন। কিন্তু আমি বাইরে বেরুতাম। নামাযের জামাতে শরীক হতাম। বাজারে ঘোরাফেরা করতাম। কেউ আমার সাথে কথা বলতোনা। মনে হচ্ছিলো, পৃথিবীটা যেন বদলে গেছে। এখানে আমি অপরিচিত। কেউ আমাকে চেনেনা। মসজিদে নামায পড়তে যেতাম। যথারীতি রসূলুল্লাহ সা. কে সালাম করতাম। জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়ে কিনা সেজন্যে অপেক্ষা করতাম। নামায অবস্থায় চুপিসারে দেখতাম, রসূলুল্লাহ সা. আমার প্রতি তাকাতেন। যেই সালাম ফেরাতাম, তিনি তাঁর দৃষ্টি অন্য দিকে নিয়ে যেতেন। হতাশ হয়ে একদিন চাচাতো ভাই ও ছোট বেলার বন্ধু আবু কাতাদার নিকট গেলাম। তার বাগানের দেয়ালের উপর উঠে তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু সেই আল্লাহর বান্দাহ সালামের জবাব পর্যন্ত দিলনা। আমি বললাম : আবু কাতাদা, তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি: আমি কি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মহব্বত করিনা? সে চুপ থাকলো। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম। সে চুপ থাকলো। তৃতীয়বার যখন আমি কসম

দিয়ে একই প্রশ্ন করলাম, তখন সে কেবল এতোটুকু বললো : আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন।" তার জবাব শুনে আমার চোখের পানি গড়িয়ে পড়লো। দেয়াল থেকে নেমে চলে এলাম। এ সময় একদিন বাজারে গেলাম। সিরিয়ার নিবতী গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলো। সে রেশমের কাপড়ে আবৃত গাসসানের রাজার পাঠানো একখানা চিঠি আমাকে দিলো। খুলে পড়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে: "আমরা শুনলাম তোমার কর্তা নাকি তোমার উপর চরম যুলুম করছে। কিন্তু তুমি তো কোনো অবহেলার পাত্র নও। তুমি এমনটিও নও যে তোমাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়া যেতে পারে। তুমি আমাদের কাছে এসে যাও। আমরা তোমাকে মর্যাদা দান করবো।" চিঠি পড়ে আমি বললাম : আমার প্রতি আরেকটা পরীক্ষা নাযিল হলো।" সাথে সাথে চিঠিটা চুলায় ঢুকিয়ে দিই ছাই করে ফেললাম।

এভাবে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলো রসূলুল্লাহ সা.-এর নির্দেশে এক লোক এসে আমাকে বলে গেলো, তোমার স্ত্রীর নিকট থেকে পৃথক থাকবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : "তালাক দিয়ে দেবো কি? জবাব পেলাম শুধু পৃথক থাকো।" সুতরাং স্ত্রীকে বললাম : তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও এবং আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকো।"

পঞ্চাশতম দিন ফজরের নামাযের পর স্বীয় ঘরের ছাদে বসে আছি। নিজেকে নিজে তিরস্কার করছি। সহসা এক ব্যক্তি চিৎকার করে বললো : "কায়াব ইবনে মালিক মুবারকবাদ"। শুনেই আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম, আমাকে ক্ষমা করে দেয়ার নির্দেশ হয়েছে। এর পর দলে দলে লোক আসতে থাকলো। প্রত্যেকেই অপরের আগে মুবারকবাদ দিতে থাকলো। তারা বলছিলো : তোমার তওবা কবুল হয়েছে।" আমি উঠে সোজা মসজিদে নববীর দিকে রওয়ানা করলাম। দেখলাম রসূলুল্লাহ সা.-এর মুখমন্ডল আনন্দে উজ্জ্বল। আমি সালাম করলাম। তিনি বললেন "তোমাকে মুবারকবাদ। আজকের এদিন তোমার জীবনের সর্বোত্তম দিন"। আমি আরয করলাম : ইয়া রসূলাল্লাহ, এ ক্ষমা কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে?" তিনি বললেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং সাথে সাথে এ আয়াতটি শুনিয়ে দিলেন। আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার সমস্ত ধন সম্পদ আল্লাহর পথে সদকা করে দেয়াও আমার তওবার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তিনি বললেন : কিছু রেখে

দেয়াটাই তোমার জন্যে উত্তম হবে।" তার হুকুম মোতাবেক খায়বরের অংশটা রেখে বাকি সব সম্পদ দান করে দিলাম। অতপর আল্লাহর সাথে ওয়াদা করলাম : যে সত্যবাদিতার জন্যে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেছেন, আমি গোটা জীবন সেই সত্যের উপর অতিবাহিত করবো।" অতপর জেনে বুঝে আজ পর্যন্ত আমি সত্যের বিপরীত কথা বলিনি। আল্লাহর নিকট এ আশা পোষণ করি যে, ভবিষ্যতেও তিনি আমাকে অসত্য থেকে রক্ষা করবেন।"

এ কাহিনীতে অনেকগুলো শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রত্যেক মুমিনের অন্তরেই বদ্ধমূল করে নেয়া উচিত।

প্রথমত, এ থেকে জানা গেলো, কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বের বিষয়টি কতোটা গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক? এ দ্বন্দ্বে কুফরকে সমর্থন করা তো দূরের কথা, ইসলামের সাহায্য সহযোগিতা করার ব্যাপারে অসৎ নিয়্যতে নয়, নেক নিয়্যতেই গোটা জীবনেও যদি কারো একবার ত্রুটি হয়ে পড়ে তবে তার গোটা জীবনের ইবাদাত-বন্দেগী ও দীনদারী বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এমনকি বদর, ওহুদ, খন্দক ও হুনাইনের মতো কঠিন যুদ্ধ সমূহে যারা জীবন বাজীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন এবং যাদের ঈমান ও ইখলাসে বিন্দু মাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিলো না- সেসব মহান ব্যক্তিরা পর্যন্ত পাকড়াও থেকে রেহাই পাননি।

দ্বিতীয়ত, দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। বরঞ্চ অনেক সময় মানুষ কেবল অবহেলা অলসতার কারণে এমন সব অপরাধ করে বসে, যা কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। তখন সে অসৎ নিয়্যতে এ অপরাধ করেনি বলে পাকড়াও থেকে রেহাই পেতে পারেনা।

তাছাড়া এ কাহিনী রসূলুল্লাহ সা.-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রাণসত্তা বড় সুন্দর ভাবে আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়। একদিকে মুনাফিকদের সর্বজন জ্ঞাত গাদ্দারী। তা সত্ত্বেও তাদের বাহ্যিক ওযর গ্রহণ করা হয় এবং ক্ষমা করে দেয়া হয়। কারণ তাদের থেকে তো কখনো নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা পাওয়া যায়নি। সুতরাং এখন তাদের বিরুদ্ধে সে জিনিসের অভাবের অভিযোগ তোলার কোনো অর্থই হয়না। অপরদিকে রয়েছেন কষ্টিপাথরের পরীক্ষিত মুমিনগণ, যাদের ত্যাগ, কুরবানী ও আত্মদান সকল প্রশ্নের উর্ধ্বে। তারা মিথ্যা মনগড়া কথা বানিয়ে বলেননা। অকপটে স্পষ্ট

ভাষায় নিজেদের দোষ স্বীকার করে নেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি ক্রোধাগ্নি বর্ষিত হয়। ব্যাপার এমনটি নয় যে, তাদের মুমিন হবার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ আছে। বরঞ্চ এর একমাত্র কারণ হলো, তাঁরা মুমিন হয়েও কেন একাজ করলেন যা কেবল মুনাফিকরাই করতে পারে?

এ আচরণের কারণ এ ছিলো যে, যমীনের সারবস্তু তো এরাই। আর তারাই যদি সার হবার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, তবে আর সার পাওয়া যাবে কোথায়? লক্ষণীয় বিষয় হলো, গোটা ব্যাপারটিতে সমাজ নেতা কিভাবে অভিযুক্তদের শাস্তি দান করেছেন আর পরিচালিতরা কি গভীর আনুগত্য ও বিনয়ের সাথে তা মাথা পেতে নিচ্ছেন। গোটা সমাজ পূর্ণ সহযোগিতার সাথে সে শাস্তি কার্যকর করছে। বিষয়টির প্রতিটি দিকই অনুপম। এ ব্যাপারে কে অধিক প্রশংসা পাবার যোগ্য তা নির্ণয় করা কঠিন। নেতা চরম কঠিন শাস্তি প্রদান করছেন, কিন্তু ঘৃণা ও বিদ্বেষের লেশমাত্র সেখানে নেই। বরঞ্চ অপরিসীম মহব্বত ও ভালবাসার সাথেই তিনি একাজ করছেন। যেনো পিতার অগ্নিবর্ষক দৃষ্টি প্রতিমুহূর্তই তাকে বলে যায় তোমার সাথে কোনো দুশমনী নেই। তোমার অপরাধের জন্যেই তোমার প্রতি আমার মনে ভীষণ দুঃখ। তুমি নিজেকে শুধরে নাও। এ হৃদয় তোমাকে সাদরে বুকে তুলে নেবার জন্যে আনচান করছে। কিন্তু আনুগত্যের পদযুগল মুহূর্তের জন্যে বিচলিত হয়না। শুধু তাই নয় নফসের অহংকার আর জাহিলিয়তের বিদ্বেষী হটকারিতা তার অন্তরে জেগে উঠেনা। প্রকাশ্য বিদ্রোহ তো দূরের কথা, নিজের প্রিয়তম নেতার বিরুদ্ধে বিন্দু মাত্র অভিযোগ মনের কোণে উদয় হয়না। বরঞ্চ তাঁর প্রতি ভালবাসায় হৃদয় অধীর হয়ে উঠে। শাস্তির পুরো পঞ্চাশটি দিন কেবল নেতার স্নেহদৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ হয় কিনা আশার এই শেষ পুরো প্রদীপটির প্রতিই বারবার উদগ্রীব দৃষ্টি ছুটে যায়। এ যেনো এক দুর্ভীক্ষ পীড়িত চাষী যার দৃষ্টি অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকে কেবল দুরাকাশের একখন্ড মেঘপুঞ্জের দিকে।

অন্যদিকে গোটা দলটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তার ডিসিপ্লীন, তার নৈতিক পবিত্রতার স্পিরিট দেখে মানুষ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে। এতো উচ্চমানের ডিসিপ্লিন যে, নেতার মুখ থেকে বয়কোটের নির্দেশ বের হওয়া মাত্র গোটা দলের প্রতিটি সদস্য অপরাধীর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। প্রকাশ্যে তো দূরের কথা নির্জনে পর্যন্ত একান্ত নিকটাত্মীয় কিংবা পরম

বন্ধুও তার সাথে কথা বলেনা। স্ত্রী পর্যন্ত পৃথক হয়ে যায়। খোদার কসম দিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমার আন্তরিকতায় কি তোমাদের কোনো সন্দেহ আছে? পরম নিষ্ঠাবান জেনে তাকে জবাব দেয়া হয়, আমাদের নিকট নয়, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট থেকে আন্তরিকতার সার্টিফিকেট লাভ করো।

আরেক দিকে নৈতিক ভাবধারা এতো উন্নত ও পবিত্র যে, এক ব্যক্তির মাথা নীচু হওয়া মাত্রই কোনো শকুনের দল তার গোশত খাওয়ার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েনা। বরঞ্চ এই গোটা শাস্তির সময়টা তাঁরা তাঁদের এই বিপদগ্রস্ত ভায়ের জন্যে মর্মবেদনা অনুভব করে এবং তাঁকে তুলে পুনরায় বুকে জড়িয়ে ধরার জন্যে তাঁরা উদগ্রীব অধীর হয়ে থাকে। আর তাঁকে ক্ষমা করে দেয়ার কথা ঘোষিত হবার সাথে সাথে তাঁরা নিমিষে তাঁর দিকে একে অপরের আগে দৌড়িয়ে এসে তাঁকে সুসংবাদ শুনায়। এ হচ্ছে সেই সত্যনিষ্ঠ সমাজের আদর্শ যা কুরআন এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

এই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ব্যক্তিগণের যে ক্ষমা লাভ হয়েছিল আর এই ক্ষমার কথা ঘোষণার ভাষায় যে দয়া ও অনুকম্পা বর্ষিত হয়েছিল, তা তাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অকৃত্রিম ইখলাসের জন্যেই বর্ষিত হয়েছিল। এর প্রমাণ তাঁরা পেশ করেছেন পঞ্চাশ দিনের কঠিন দন্ড ভোগ কালে। অপরাধ করার পর তাঁরা যদি অহংকারী হয়ে পড়তেন এবং নেতার অসন্তোষের জবাবে ক্রোধ ও শত্রুতায় নিমজ্জিত হতেন; আর দন্ডাদেশের ফলে অহংকারী লোকদের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন; বয়কোট কালে যদি "বিচ্ছিন্ন থাকতে রাজি কিন্তু অহমীকা বর্জনে রাজি নয়" এরূপ ভাবাচরণ প্রদর্শন করতেন; এই দীর্ঘ দন্ড ভোগ কালে যদি সমাজের লোকদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়াবার চেষ্টা করতেন আর অন্যান্য অসুন্তুষ্ট ক্ষুদ্ধ লোকদের খুঁজে খুঁজে যদি একটি সংস্থা গড়ে তুলবার চেষ্টা করতেন তবে তাদের ক্ষমা করবার কোনো প্রশ্নই উঠতোনা। তাদেরকে তো অবশ্যি সমাজ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে নিক্ষেপ করা হতো। আর তখন এ শাস্তির পর নতুন করে তাদের চিরদিনের তরে হঠকারিতায় লিপ্ত থাকার শাস্তি প্রদান করা হতো। এরপর আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করার চেষ্টা সংগ্রামে অংশ নেবার সৌভাগ্য তাদের আর কোনো দিনই হতোনা।

কিন্তু এই তিনজন বুযুর্গই কঠিন দন্ড ভোগ কালে এরূপ পন্থা অবলম্বন করেননি। যদিও এরূপ করার পথ তাদের জন্যে খোলা ছিলো। পক্ষান্তরে তাঁরা সেই আদর্শ নীতিও ভাবধারাই অবলম্বন করেন যা এই মাত্র আপনারা পড়ে আসলেন। এই আদর্শ নীতি ও আচরণের পথ অবলম্বন করে তাঁরা প্রমাণ করলেন যে, খোদার আনুগত্য ও দাসত্ব তাঁদের হৃদয় থেকে সকল মূর্তি ও দেবতার আনুগত্য চিরতরে খতম করে দিয়েছে। নিজেদের গোটা সত্তাকে তারা আল্লাহর পথে চেষ্টা সংগ্রামের কাজে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। নিজের ফিরে যাবার জাহাজগুলো তারা এমনভাবে জ্বালিয়ে দিয়ে ইসলামি সমাজে প্রবেশ করেছেন যে, এখান থেকে কোথাও প্রত্যাবর্তনের কোনোই অবকাশ নেই। এখানেই আঘাতে আঘাতে বিক্ষত হবেন, কিন্তু বিন্দু মাত্র বিচলিত হবেন না। অন্য কোনো স্থানে বিরাট সম্মান ও মর্যাদা পাওয়া গেলেও তা তারা কিছুতেই গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবেননা। এরপরও যদি এমন লোকদেরকে বুকে তুলে নেয়া না হলো, তবে আর কী-ই করা হলো! একারণে মহান আল্লাহ এমন মহব্বতের ভাষায় তাদের ক্ষমার কথা ঘোষণা করলেন : "আমি তাদের দিকে ফিরলাম যেনো তারা আমার দিকে ফিরে আসে।"

এ ক'টি শব্দ এমন এক মর্মস্পর্শী চিত্র অংকিত হয়েছে যে, মনিব তো প্রথমে গোলামদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন, কিন্তু তারা যখন স্থান ত্যাগ করে চলে গেলনা, বরঞ্চ মন ভাংগা হয়ে তাঁরই দুয়ারে বসে থাকলো, তখন তাদের চরম আনুগত্যের পরম ভাবধারা দেখে মনিব আর স্থির থাকতে পারলেন না। মহব্বতের আতিশয্যে বেরিয়ে এসে দরজা থেকে গোলামদের বুকে তুলে নিলেন।[৩৫]

* * *

সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন রুহামাউ বাইনাহুম

প্রশ্ন : কয়েক দিন পূর্বে আমার 'সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা বিষয়ে বক্তব্য রাখার সুযোগ হয়। বক্তৃতা প্রসংগে আমি নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যা করি :

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

অর্থ: মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। আর যেসব লোক তাঁর সংগী-সাথী, তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেরা পরস্পর পূর্ণ দয়াশীল।"

বক্তৃতা শেষ করার পর একব্যক্তি প্রশ্ন করলো, কুরআন তো সাহাবায়ে কিরামের এই বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। কিন্তু বাস্তব ঘটনাবলীর চিত্র এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সিফফীন ও জামালের যুদ্ধে উভয় পক্ষেই বড় বড় সাহাবীরা বর্তমান ছিলেন। উম্মুল মুমিনীন আয়িশা সিদ্দীকা রা. পর্যন্ত এক পক্ষে ছিলেন। এসব ঘটনাবলীর আলোকে (তারা পরস্পর পূর্ণ দয়াশীল) আয়াতাংশটির তাৎপর্য কি হতে পারে? এ বিষয়ে আমার সাধ্যানুযায়ী চিন্তা করেছি। কিছু কিছু দীনি কিতাব অধ্যয়ন করে দেখেছি। আলিম বন্ধুদের নিকট জানতে চেয়েছি। কিন্তু কিছুতেই পূর্ণ আশ্বস্ত হতে পারিনি, তাই আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। মেহেরবাণী করে উক্ত ঘটনাবলী সম্মুখে রেখে আয়াতাংশটির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য জানাবেন, যাতে করে এ বিষয়ে যাবতীয় সন্দেহ সংশয় বিদুরিত হয়ে যায়।

জবাব : আমি দুঃখিত যে অনেক দেরি করে আপনার পত্রের জবাব দিচ্ছি। এ মাসে দারুণ ব্যস্ততা ছিলো, যার কারণে প্রাপ্ত চিঠি পত্র পড়ারই সময় হয়নি, জবাব দেওয়াতো দুরের কথা। আশা করি আমার সমস্যা ও অপারগতার প্রতি লক্ষ্য রেখে দেরি হবার জন্যে মনে কিছু নেবেন না।

"আশিদ্দাউ আ'লাল কুফফার রুহামা বাইনাহুম" আয়াতটি সম্পর্কে সম্মানিত প্রশ্ন কর্তা যে সন্দেহ সংশয় প্রকাশ করেছেন, তার ভিত্তি দুটি অনুমান ও কল্পনার উপর। আর উভয়টিই প্রকৃত সত্যের বিপরীত-অবাস্ত ব। প্রথম অনুমানটি হচ্ছে এই যে, কোনো ব্যক্তি সমষ্টির প্রশংসা করে কোনো কথা বলা হলেই সেকথার এই অপরিহার্য অর্থ ধরে নেয়া যে, সে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যে কখনো উক্ত প্রশংসার বিষয়ে সামান্য-

আংশিক ত্রুটি-বিচ্যুতিও পাওয়া যেতে পারবে না। অথচ এ এক শাশ্বত নিয়ম, যখনই মানুষের প্রশংসা করা হয়, তা করা হয়ে থাকে তার প্রভাবশীল-প্রস্ফুটিত ও বিজয়ী অবস্থার ভিত্তিতে। কখনো এর বিপরীত কোনো কিছু তার মধ্যে পরিলক্ষিত হলেই তা তার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যকে বাতিল করে দেয়না। আমরা সাহাবায়ে কিরামকে পৃথিবীর সর্বাধিক পরহেযগার ও নেককার লোক সমষ্টি বলে আখ্যায়িত করি। তাঁদের জীবন চরিত্রের সামগ্রিক বিচারে তাঁদের এ বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, মানুষ হিসেবে কখনো তাঁদের মধ্যে কোনো প্রকার মানবিক দুর্বলতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হতোনা।

সে যুগেও তো কারো ব্যভিচারের, কারো চুরির, কারো মিথ্যা দোষারোপের শাস্তি হয়েছিল। আর এই সাজাপ্রাপ্ত লোকেরা সাহাবীত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেননা ঈমান আনার পর যে ব্যক্তিই রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথীত্ব লাভ করেছিলেন, তিনি সর্বাবস্থায়ই সাহাবী ছিলেন। আর এ ধরনের অপরাধী হয়ে যাবার ফলে না তাদের ঈমান চলে গিয়েছিল আর না বাতিল হয়েছিল তাদের সাহাবী হবার মর্যাদা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁদের সমাজে ব্যভিচার, চুরি ও অপবাদের প্রসার ঘটেনি। এগুলো ছিলো নিতান্ত ই বিচ্ছিন্ন দুয়েকটি ঘটনা। সংস্কার সংশোধন এবং তাকওয়া ও পরহেযগারীর দিক থেকে তাঁরা উচ্চতম শিখরে আরোহন করতে পেরেছিলেন। পৃথিবীর কোনো মানব সমাজ কখনো সে স্তরে পৌঁছতে পারেনি। এখন বলুনতো উক্ত দুয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা তাঁদের এই সামগ্রিক গুণ বৈশিষ্ট্যকে মসিলিপ্ত করতে পারে কি?

এমনি করে রুহামাউ বাইনাহুম বৈশিষ্ট্যটি তাঁদের সামগ্রিক চরিত্র ও বিজয়ী স্বভাবের ভিত্তিতে নিরূপিত। এ ব্যাপারেও প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, কখনো কোনো মানব সমাজকে পারস্পারিক মায়া মুহাব্বাত, দয়া-অনুগ্রহ এবং সহমর্মিতা ও কল্যাণ কামনার দিক থেকে আর পরস্পরের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দিক থেকে এতোটা উচ্চস্তরের পাওয়া যায়নি, যে পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন সাহাবায়ে কিরামের সমাজ। সমষ্টিগত দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এ গুণটি তাঁদের মধ্যে সম্ভাব্য পরিপূর্ণতা লাভ করে, যতোটা অন্য কোনো মানব সমাজের ব্যাপারে কল্পনাই করা যেতে পারেনা। কিন্তু মানুষ যতোক্ষণ মানুষই থাকছে, ততোক্ষণ তাদের মধ্যে অবশ্যি মতপার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে। মতপার্থক্য ঝগড়া বিবাদের রূপও ধারণ করতে পারে। সাহাবায়ে কিরামও মানুষই ছিলেন। উর্ধ্ব জগত হতে

কোনো অতি মানব গোষ্ঠি মুহাম্মদ সা. এর সাথীত্বের জন্যে নাযিল হয়ে আসেনি। একে অপরের সঙ্গে উঠা-বসা, লেনদেন ও সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে অবশ্যি মানুষ হিসাবে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হতো এবং এই মতপার্থক্য কখনো কখনো শক্ত আকারও ধারণ করতো। কিন্তু এসব খুঁটিনাটি ঘটনা দ্বারা তাঁদের সেই সামষ্টিক সোনালী বৈশিষ্ট্য 'রুহামাউ বাইনাহুম' এর মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হতোনা। কেনান এটা ছিলো তাঁদের শক্তিশালী বিজয়ী বৈশিষ্ট্য।

এই সন্দেহ-সংশয়ের পিছনে দ্বিতীয় যে অনুমানটি কাজ করছে তা হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কখনো কোনো মতপার্থক্য প্রকাশিত হয়ে থাকলে তার গুরুত্ব এতোই বেশি করে দেখা হয় যে, তাতে যেন তাঁদের "রুহামাউ বাইনাহুম" বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেছে। অথচ তাঁদের মতপার্থক্যের যে ইতিহাস আমাদের নিকট পৌঁছেছে তা সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, এই পবিত্রাত্মার লোকদের পরস্পরের মধ্যে যখন লড়াই পর্যন্ত সংঘটিত হতো, তখন লড়াই ক্ষেত্রে পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে 'রুহামাউ বাইনুহুম'-এর অনুপম বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হতো। জামাল, সিফফিনের যুদ্ধে অবশ্যি তাঁরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর কোনো যুদ্ধের ইতিহাসে কি আপনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের কাউকেও পরস্পরের প্রতি এমন সম্মান প্রদর্শন করতে দেখেছেন, যেমনটি দেখা গেছে এই বুযুর্গ সাহাবীগণের মধ্যে? তাঁরা একান্তই নেক নিয়্যত ও আন্তরিকতার সাথে নিজেকে হকের পক্ষে মনে করে লড়াই করেছেন। ব্যক্তিগত শত্রুতা ও ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার জন্যে কেউ লড়াই করেননি। অপর পক্ষ তাদের পজিশনকে ভুল মনে করেছে এবং স্বীয় ভুল পজিশনকে ভুল বলে অনুভব করতে পারছেনা বলে তাঁরা আফসোস করতেন। তারা এক পক্ষ অপর পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে যুদ্ধ করেননি। বরঞ্চ নিজেদের জ্ঞান অনুযায়ী অপর পক্ষকে সঠিক পথে আনতে চাইতেন। তাঁদের কেউ অপরের ঈমানকে অস্বীকার করতেন না। অপরের ইসলামি অধিকার সমূহ অস্বীকার করতেন না।

এমনকি অপরের মর্যাদা এবং ইসলামের জন্যে কৃত সেবা সমূহকেও অস্বীকার করতেন না। তাঁরা একে অপরকে হীন-লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেননি। যুদ্ধের সময় অবশ্যি তাঁরা যুদ্ধের হক আদায় করেছেন। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত ও নিহতদের প্রতি তাদের ছিলো প্রাণভরা মুহাব্বাত। যুদ্ধ বন্দীদের বিরুদ্ধে মুকাদ্দমা দায়ের করা, তাদের শাস্তি প্রদান করা কিংবা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করাতো দূরের কথা, তাদেরকে বন্দী করে

ফেলে রাখা এবং তাদের উপর কোনো প্রকার জিদ উঠানো পর্যন্ত ছিলো তাঁদের নীতি বিরুদ্ধ। লক্ষ্য করে দেখুন, জংগে জামালে উভয় পক্ষ যখন মুখোমুখি দন্ডায়মান, আলী রা. অপর পক্ষের যুবাইরকে রা. কাছে ডাকেন। তিনিও নির্দ্বিধায় তাঁর নিকট চলে আসেন। তাদের উভয়ের কারোই অপরের সম্পর্কে এ আশংকা ছিলনা যে তিনি হঠাৎ করে তাঁকে আক্রমণ করবেন। উভয় ফৌজের মাঝখানে তাঁরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন। উভয় পক্ষের সৈন্যরা তাদের অবস্থা দেখে হয়রান হয়ে যান, যেখানে তাঁরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছেন, সেখানে একে অপরের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন। একান্তে কথাবার্তা বলে তাঁরা নিজ নিজ ফৌজের দিকে ফিরে যান। আলীর ফৌজের লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, আমীরুল মুমিনীন! কেন আপনি উন্মুক্ত যুদ্ধের ময়দানে বিরুদ্ধ পক্ষের এক উন্মুক্ত তরবারিধারী ব্যক্তির সংগে একা একা সাক্ষাত করতে গেলেন? এর জবাবে তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেন : জানো তিনি কে? তিনি রসূলের ফুফু সাফিয়ার রা. পুত্র। আমি রসূলুল্লাহর একটি কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। তিনি বলেছেন : কতোইনা ভালো হতো আরো পূর্বে যদি আমার একথা স্মরণ হতো। তাহলে আপনার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করতে আসতাম না'। একথা শুনে লোকেরা বলেন : আলহামদুলিল্লাহ! আমীরুল মুমেনীন, তিনি তো রসূলুল্লাহর হাওয়ারী। তিনি তো রসূলুল্লাহ সা.-এর শাহসওয়ার! তাঁর জন্যেই আমরা বেশি ভয় পাচ্ছিলাম।' অপরদিকে যুবাইর স্বীয় বাহিনীর নিকট ফিরে গিয়ে বলেন শিরক এবং ইসলামের মধ্যে সংঘটিত কোনো লড়াইয়ে যখনই আমি অংশ গ্রহণ করেছি, তাতে আমি বিচক্ষণতার সাথে যুদ্ধ করেছি। কিন্তু এ যুদ্ধে না আমার মন সাড়া দেয় আর না বিচক্ষণতা।' একথা বলে তিনি ফৌজ থেকে বের হয়ে চলে যান। একই ভাবে আলী রা. এবং তালহা রা.-এর মধ্যে উভয় বাহিনীর মাঝখানে একান্তে সাক্ষাত হয়। তাঁরা এক অপরকে নিজ মত মানাতে চেষ্টা করেন। লড়াই আরম্ভ হলে আলী নিজ বাহিনীকে সম্বোধন করে ঘোষণা করেন : সাবধান! কাউকেও শাস্তি দিয়ে হত্যা করবেনা। আহতদের গায়ে হাত উঠাবেনা। বিরুদ্ধ পক্ষের যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফেলে যাওয়া মাল তোমরা গ্রহণ করতে পারো। কিন্তু তাদের শহীদদের ঘরে যে মাল সম্পদ রয়েছে সেগুলো তাদের উত্তরাধিকারীদের হক। তাদের স্ত্রীদের জন্যে ইদ্দত পালন করতে হবে।' এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন : যেহেতু তাদের মাল সামান আমাদের জন্যে বৈধ, তবে তাদের স্ত্রীরা বৈধ হবেনা কেন? আলী রা.

ক্রোধান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মাতা আয়িশাকে রা. গ্রহণ করতে প্রস্তুত? লোকেরা সমস্বরে বলে উঠলো : আস্তাগফিরুল্লাহ! যুদ্ধ শেষে আলী নিহতদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। তালহার পুত্র মুহাম্মদের লাশ দেখতেই অবলিলাক্রমে তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে :

رَحِمَكَ اللّٰهُ يَا مُحَمَّدُ لَقَدْ كُنْتُ فِى الْعِبَادَةِ مُجْتَهِدًا اٰنَاءَ اللَّيْلِ قَوَّامًا فِى الْحَرِّ صَوَّامًا •

"হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন। তুমি ছিলে বড় ইবাদত গুযার! নিশি রাত জেগে নামায আদায়কারী। কঠিন গরমের সময় রোযাদার।"

যুবায়ের রা.-এর হত্যাকারী ইনামের আশায় হাজির হলে তিনি তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ (!) প্রদান করেন। উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রা.-এর তাঁবুর নিকট পৌঁছলে কেবল এতটুকুই বলেন : "হে তাঁবুবাসিনী! আল্লাহ্ আপনাকে ঘরে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ আপনি যুদ্ধ করার জন্যে বেরিয়ে এসেছেন। অতপর অত্যন্ত সম্মানের সাথে তিনি তাঁকে মদিনা পাঠিয়ে দেন।* অন্যদিকে আয়িশা রা.-ও এই সদাচরণের জন্যে তাঁকে দিল খুলে দোয়া করেন :

جَزَى اللّٰهُ ابْنَ اَبِى طَالِبَ الْجَنَّةَ •

"আল্লাহ আবু তালিবের পুত্রকে জান্নাত দ্বারা পুরস্কৃত করুন।

তালহা* রা.-এর পুত্র মুসা রা. আলী রা.-এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসলে তিনি তাকে বসতে দিয়ে বলেন : আমি আশা করি তোমার পিতা সেই সব লোকদের মধ্যে হবেন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন: "আমরা তাদের অন্তরের সমস্ত কালিমা বিদুরিত করে দেবো আর তারা জান্নাতে মুখোমুখি আসন সমূহে ভাই ভাই হিসেবে উপবেশন করবে।"

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে : এ কে আপনার নিকট এসেছিল? তিনি বলেন : সে আমার ভাতিজা। লোকটি বললো : সে যদি আপনার ভাতিজাই হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তো বদবখত হয়ে যাই। আলী রা. লোকটির উপর

---

* এ যুদ্ধে আয়িশা রা. বিরুদ্ধ পক্ষের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। -অনুবাদক
* প্রকাশ থাকে যে, তালহা রা. জামাল যুদ্ধে আলী রা.-এর বিপক্ষে যুদ্ধে এসেছিলেন। -অনুবাদক

অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন : তোমার ধ্বংস হোক। আল্লাহ্ বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের বলে দিয়েছেন : আমি তোমাদের মাফ করে দিয়েছি। তোমরা যেরূপ ইচ্ছা আমল করো।"

এবার চিন্তা করে দেখুন, তাঁদের পারস্পরিক লড়াইয়ের প্রকৃতি কিরূপ ছিলো! তাঁরা পরস্পরের প্রতি তলোয়ার উত্তোলন করেও রুহামাউ বাইনাহুম ছিলেন। কঠিন যুদ্ধাবস্থায়ও তাঁদের পরস্পরের মর্যাদা, সম্মান, মুহাব্বাত, ইসলামি অধিকার সমূহ পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন ছিলো। পূর্বের তুলনায় তাতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য সৃষ্টি হয়নি। পরবর্তী লোকেরা তাঁদের কারো প্রতি দরদী হয়ে যদি অপরকে গালি দিয়ে থাকে, তবে তা এ লোকদেরই বদতমিজী। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম শত্রুতার বশবর্তী হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করতেননা। আর লড়াই করেও তাঁরা পরস্পরের শত্রু হতেননা। তরজমানুল কুরআন : যুলহজ ১৩৭৬ হিজরি, সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ ঈসায়ী।[৩৬]

সমাপ্ত

তথ্য নির্দেশিকা

০১. তাফহীমুল কুরআন সূরা আহযাব টীকা ৩৬
০২. তাফহীমুল কুরআন সূরা কাহফ টীকা ২৮
০৩. তাফহীমুল কুরআন সূরা মুমিন টীকা ০৬
০৪. তরজুমানুল কুরআন জুন ১৯৫৯ইং পৃষ্ঠা ১৮৬
০৫. তাফহীমুল কুরআন সূরা ফাতহ টীকা ৫৪
০৬. তাফহীমুল কুরআন সূরা আনফাল ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ১৩১-১৩৩
০৭. তাফহীমুল কুরআন সূরা আনফাল ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ১৩৮-১৪৩
০৮. তাফহীমুল কুরআন মূল ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ৫৫
০৯. তাফহীমুল কুরআন সূরা শোয়ারা টীকা ১৩৯
১০. তাফহীমুল কুরআন সূরা হজ্জ টীকা ১২৯
১১. তাফহীমুল কুরআন সূরা হাশর টীকা ২১
১২. তরজুমানুল কুরআন আগস্ট ১৯৬১ইং পৃষ্ঠা ৫৩
১৩. করাচীর মুহাম্মদ সুলায়মান সিদ্দিকীর নামে প্রেরিত চিঠি
১৪. তাফহীমুল কুরআন সূরা ফাত্হ টীকা ৫৭
১৫. তাফহীমুল কুরআন সূরা তাওবা ভূমিকা
১৬. তাফহীমুল কুরআন সূরা ফাত্হ টীকা ৩২
১৭. খিলাফত ও মুলুকিয়াত অধ্যায় : খিলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য
১৮. খিলাফত ও মুলুকিয়াত মূল বইয়ের পৃষ্ঠা ২৩১-২৩২
১৯. তরজুমানুল কুরআন জুন ১৯৫৯ঈসায়ী পৃষ্ঠা ৫৯
২০.
২১.
২২. তাফহীমুল কুরআন সূরা ফাত্হ টীকা ১৭
২৩. খিলাফত ও মুলুকিয়াত অধ্যায় : খিলাফতে রাশেদা
২৪. খিলাফত ও মুলুকিয়াত অধ্যায় : খিলাফত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য
২৫. খিলাফত ও মুলুকিয়াত মূল বইয়ের পৃষ্ঠা ৯১-৯৪
২৬. খিলাফত ও মুলুকিয়াত অধ্যায় : খিলাফতে রাশেদা থেকে রাজতন্ত্র পর্যন্ত
২৭. ইসলামী রিয়াসত, ২য় সংস্করণ, মূল বইয়ের পৃষ্ঠা : ২৯০
২৮. করাচির আনোয়ার আব্বাসীকে প্রেরিত চিঠি
২৯. খিলাফত ও মুলুকিয়াত মূল বইয়ের পৃষ্ঠা ৮৬
৩০. খিলাফত ও মুলুকিয়াত মূল বইয়ের পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮
৩১. খিলাফত ও মুলুকিয়াত মূল বইয়ের পৃষ্ঠা ৯৬
৩২. খিলাফত ও মুলুকিয়াত মূল বইয়ের পৃষ্ঠা ৮৮
৩৩. খিলাফত ও মুলুকিয়াত মূল বইয়ের পৃষ্ঠা ১০০-১০২
৩৪. খিলাফত ও মুলুকিয়াত মূল বইয়ের পৃষ্ঠা ১০০-১০২
৩৫. তাফহীমুল কুরআন সূরা কাহ্ফ, টীকা ১১৯
৩৬. রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খন্ড, মূল বইয়ের পৃষ্ঠা ১৭০-১৭৭